পূর্বপুরুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আজ সারাদিন ঝাঁকে-ঝাঁকে বৃষ্টি। কখনও একটু থামে আবার প্রবলভাবে আসে। এমন বৃষ্টির মধ্যেও কেউ-কেউ পুকুরে স্নান করতে যায়, তাও সন্ধেবেলা।

আদিনাথ চৌধুরী প্রতিদিন দু'বেলা আহ্নিক করেন, তার আগে স্নান করে নিতেই হয়। সেই সময় একবুক জলে দাঁড়িয়ে স্তব করেন প্রভাত ও সন্ধ্যা সূর্যের। মাথায় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, তবু তিনি প্রতিদিনের এ অভ্যেস ছাড়তে পারেন না।

এই পুকুরটা বারোয়ারি। আকারে খুব বড় এবং চতুষ্কোণ, একে দিঘি বলাই উচিত। তিন দিকেই বসতি আছে, তাই তিনটি ঘাট। অন্য দিকটায় ফলের বাগান, সেখানে কিছু কিছু গাছ এত পুরনো আর লম্বা যে, অন্য পাড় থেকে ঘন জঙ্গল বলে প্রতীতি হয়। ওখানে কেউ লুকিয়ে থাকলে বোঝার উপায় নেই। সেরকম থাকেও।

একটি ঘাট শুধু রমণীদের জন্য নির্দিষ্ট। সে ঘাটের দু'পাশে দু'টি চালতা গাছ। পুরুষদের পক্ষে ভুল করেও সে ঘাটে যাওয়ার কথা নয়। দামাল ছেলেরা চালতা পাড়তে এলেও বকুনি খায়। একমাত্র সুরেশ্বরই এ নিয়ম মানে না, সে যখন তখন ঘাটের পৈঠায় বসে থাকে। প্রথম প্রথম তাকে বকাবকি করা হলেও এখন সবাই বুঝে গেছে যে, সুরেশ্বরের খামখেয়ালিপনা অসংশোধনীয়। মানুষটা তো এমনিতে বদ নয়। মেয়েরাও রাগ করে না। বয়স্কা মহিলাদের কেউ সকৌতুকে তার কান মুলে দিয়ে বলেন, এই বোমভোলানাথ, এখন যা এখান থেকে। আমরা কাপড় ছাড়ব না?

আদিনাথ জলে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াতে-আওড়াতে দেখতে পেলেন, এই বর্ষণের মধ্যেও মেয়েদের ঘাটে রয়েছে কয়েকজন। অন্যান্য পল্লি থেকেও মেয়েরা এই ঘাটে জল সইতে আসে। শোনা যাচ্ছে তাদের কলকণ্ঠ। এই পুকুর ঘাটটা আশপাশের কয়েকটি বাড়ির স্ত্রীলোকদের আড্ডাস্থল। মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে কেমন করে কথা বলে, তা পুরুষরা কোনও দিন জানতে পারবে না।

বৃষ্টি পতনের শব্দ গাছপালার মধ্যে একরকম, টিনের চালে একরকম। আর পুকুরের জলে একেবারে আলাদা। এই শব্দের মধ্যে আদিনাথের উচ্চারিত মন্ত্র তাঁর অভীষ্ট দেবতারা কীভাবে শুনতে পাবেন কে জানে? এখন বরুণদেবেরই একচ্ছত্র অধিষ্ঠান। কিন্তু তাঁর নামে কোনও শ্লোক এখানকার কারও জানা নেই। দেবতারা বহু দূরে থাকেন, সেই জন্যই বোধহয় আদিনাথ মন্ত্রোচ্চারণ করেন খুব জোরে জোরে। অথবা তিনি নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালবাসেন।

পরনে একটা গেরুয়া রঙের লুঙ্গি, খালি গা, প্রশস্ত বুকে কাঁচা-পাকা রোম। সুগঠিত শরীর। মুখে তেমন রেখা নেই, আদিনাথের ছাপ্পান্ন বছর বয়স ঠিক বোঝা যায় না। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে তিনি ওপরে উঠে এলেন। গামছাটাও জবজবে ভিজে। এখন মাথা মোছার কোনও মানেও হয় না, ঝুলিয়ে নিলেন কাঁধে।

আদিনাথ চৌধুরীর বাড়ি ঠিক এই পুকুরের ধারে নয়, খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। সরু পায়ে চলা পথ। দু'ধারে প্রচুর বুনো কচুর ঝোপ। তারই মধ্যে-মধ্যে কয়েকটা আমলকী আর হরিতকী গাছ। প্রথম বাড়িটি বদি চাটুজ্জেদের। এরা সদ্য পনেরো-ষোলোটি সুপারি গাছ লাগিয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে এই গাছগুলি ঠিকঠাক ফলনশীল হলে এদের অবস্থাটা বদলে যেতে পারে। সুপুরির দাম চড়ছে দিন দিন। এখন নাকি সুপুরি চালান যাচ্ছে দিল্লি-লাহৌর, তাই দাম বাড়ে বাংলার গ্রামে।

সুলেমানপুর যাবার জন্য একজন মাঝির ব্যবস্থা করতে হবে। চৌধুরীদের নিজস্ব নৌকো আছে, কিন্তু তাঁদের বাঁধা মাঝি কুটিশ্বর কিছু দিন ধরে ভুগছে কাশ রোগে। একটু পরিশ্রম হলেই কাশতে-কাশতে নুয়ে পড়ে। তার শ্লেষ্মার সঙ্গে নাকি রক্তের ছিটেও দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। বেশি কাশিতে গলা চিরে গেলে আবার নিজে-নিজেই সেরে যায় এরকম হতে পারে। আর যদি রাজরোগ হয় তো আর কোনও আশাই নেই। কুটিশ্বরের বদলে অন্য মাঝি নিয়োগ করলেও হবে। কালকের মধ্যে অন্য লোক পাওয়া যাবে কোথায়? কুটিশ্বর কিছুতেই এই নৌকোয় অন্য মাঝিকে হাত দিতে রাজি হয় না। এই শরীর নিয়ে সে এখনও নিজেই যেতে চায়। কাল রাতে তার জ্বর বেড়েছে। জগুকে কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যে কি জগুর ওপর ভরসা করা যায়? জগুর চেহারাটা অনেক বড় কিন্তু মাথাটা অনেকখানি খালি।

সুলেমানপুর গ্রামে তাঁর দ্বিতীয় শ্বশুরালয়। পান্নারানির সঙ্গে তাঁর সাত মাস দেখা হয়নি। অথচ পান্নারানির বাবা- মা দু'জনেই জীবিত। জামাই হিসেবে আদিনাথকে তাঁরা যথেষ্ট খাতির-যত্ন করেন। ফেরার সময় অনেকগুলি পোঁটলা-পুঁটলি দিয়ে দেন। শুধু মেয়েকে তাঁরা শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে রাজি নন। আদিনাথও ঘনঘন সুলেমানপুরে যেতে পারেন না বলে পান্নারানির খুব অভিমান। এদিকে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এত ঝামেলা থাকে। এবারে তিনি যাবেনই, আগামী কাল দ্বিপ্রহর একটা গতে যাত্রা শুভ। অন্য মাঝি না পাওয়া গেলে জগুকেই... তিনি নিজেও মাঝে-মাঝে বৈঠা ধরতে পারেন।

কিছু দূরে কোনও বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। এটা আদিনাথের সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময়। ন'বছর বয়সে উপনয়ন হয়েছিল, তারপর এতগুলি বছর তিনি নিয়মিত দু'বেলা আহ্নিক করেন, ভক্তিমান মুসলমানদের নামাজ পড়ার মতন। কখনও যাত্রাপথে সন্ধে হয়ে গেলে তিনি নৌকোর উপর বসেই আহ্নিক সেরে নেন, এ একরকম নেশা।

এঃ, কচুগাছগুলো এমন ফনফনিয়ে বেড়েছে যে, এখানে এখন মশার আড্ডা হয়েছে, ভনভনিয়ে ঘুরছে মাথার ওপরে। পায়ে জোঁক লেগে গেল কি না, কে জানে। আদিনাথ ঠিক করলেন, বদি চাটুজ্জেরা কিছু করুক বা না করুক, তিনি নিজেই কচুগাছের ঝোপ সাফ করার উদ্যোগ নেবেন, পান্নারানির কাছ থেকে ফেরার পর...। তারপর এখানে লাগিয়ে দেবেন কিছু গন্ধলেবু গাছের চারা। তারপর লেবু ফলন হবার পর অনেকেই হাত বাড়াবে। তা নিক...।

এখনও পুরোপুরি সন্ধে হয়নি। বৃষ্টির জন্য আগে আগেই অন্ধকার ভাব হলেও কিছু চাপা আলোও আছে। পথটা কাদা কাদা, বাড়িতে গিয়ে পা ধুতে হবে আবার। এখানে জোঁকের খুব উপদ্রব। নিঃশব্দে পায়ে সেঁটে থাকে। আদিনাথ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, একবার বিদ্যুৎ চমকাতেই তিনি থমকে গেলেন। একটা উদ্যত পা সামলালেন কোনওক্রমে। পথের মধ্যে আড়াআড়িভাবে মোটা কাছির মতো যেটা পড়ে আছে, সেটা নিশ্চিত একটা সাপ। মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। সেটা কচু বনের মধ্যে। অস্পষ্ট আলোয় আদিনাথ ভালভাবে নিরীক্ষণ করে বুঝলেন, এ গোক্ষুর সাপ নির্ঘাত।

অন্য অনেকেই এই কালান্তক সর্পকে দেখে ভয়ে পিছিয়ে যেত, কিন্তু আদিনাথ সে ধাতুতে গড়া নন। বাল্যকাল থেকে তিনি কত না সাপ দেখেছেন। অল্প বয়সে সাপের লেজ ধরে বনবন করে ঘুরিয়েছেন মাথার উপর। এখন সে বয়স নেই, আর গোখরো সাপ নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না। ভয় পাওয়ার বদলে তিনি বিরক্তি বোধ করলেন। তাঁর আহ্নিকের সময় হয়ে গেছে।

প্রথমে তিনি অভ্যাসবশে তিন বার বললেন, অস্তীক, অস্তীক, অস্তীক। তারপর বললেন, এই হারামজাদা, সর এখান থেকে।

মানুষের কোনও কথা সাপ শুনতে পায় না, তাদের সে শ্রবণশক্তি নেই। তাই সাপটা অনড় হয়ে রইল। সাপটার মাথা দেখা যাচ্ছে না, তাই ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বহুকালের সংস্কার, কোনও জীবিত প্রাণীকে ডিঙোতে নেই। বাল্যকালে একটি ঘুমন্ত বিড়ালকে ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন বলে আদিনাথ তাঁর বাবার হাতে মার খেয়েছিলেন। সাপটা একটু নড়াচড়াও করছে না।

পাশ দিয়ে নেমে কচুবনের মধ্য দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এই গোখরোর মাথাটা কোন দিকে? আদিনাথ মোটামুটি আন্দাজ করে নিলেন, ডান দিকেই হবে। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না, তিনি বাঁ দিকে নামতে গেলেন।

সাপের শ্রবণশক্তি নেই, কিন্তু সামান্য ভূকম্পন কিংবা গাছপাতার আলোড়ন হলেই সে টের পায়। সঙ্গে-সঙ্গে সে মাথা তুলল, তার ফণার আকার বেশ বড়। তাতে গরুর খুর আঁকা আছে। কেউ-কেউ ওটাকে বিষ্ণুর পদচিহ্নও বলে।

আদিনাথ নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাপটা যে তাকে কামড়াতে পারে, এ চিন্তাই তাঁর মাথায় এল না। এর আগেও কত বার সাপের সামনাসামনি পড়েছেন। তিনি জানেন, মানুষ যদি আক্রমণ না করে কিংবা না জেনে সাপের গায়ে পা না ঠেকায়, তা হলে এরা আগ বাড়িয়ে দংশন করে না। একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে, ওরা একটুক্ষণ ফণা দুলিয়ে অবস্থাটা বুঝে নেয়, তারপর নিজেরাই সরে যায়।

তিনি অবিচলিত থেকে ধীর স্বরে বললেন, ওরে, হট এবার। ব্রাহ্মণের পথ ছেড়ে দে।

সর্ব বিষয়ে ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকারের ব্যাপারটি এই সর্প বুঝল না। রাস্তা ছাড়ার কোনও লক্ষণ তার নেই, সে মাথা দোলাতেই লাগল।

এক্ষেত্রে এরকম বিষধরদের জব্দ করার একটা সহজ উপায় আছে। কাঁধের গামছাটি অতি দ্রুত ওর গায়ের উপর ছুড়ে দিতে পারলেই ও তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে, মানুষটির প্রতি আর নজর না দিয়ে সেই গামছার ওপরই বারবার ছোবল মারবে।

আদিনাথ জানেনও এই প্রক্রিয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেকথা মনে পড়ার আগেই তাঁর কাঁধের গামছাটি গড়িয়ে পড়ে গেল তাঁর ডান পায়ের উপর। সাপটি অমনি বিদ্যুৎবেগে ছোবল দিল সেই পায়ে। দাঁত ফুটে গেল গুলফে।

আদিনাথ সেই পা-টা তুলে এমন জোরে ঝটকা দিলেন যে, সাপটা আঁকড়ে থাকতে পারল না, ছিটকে পড়ল অনেকটা দূরে।

আদিনাথ এবার দ্রুতবেগে হাঁটা শুরু করলেন। সাপটা যদি বা তাড়া করে আসে, এই ভেবে তিনি কয়েক মুহূর্ত পরেই শুরু করলেন দৌড়।

সাপটা দংশেছে ঠিকই, কিন্তু বিষ ঢালতে পেরেছে কি পারেনি? তার জন্য একটু সময় লাগে। বিষের জ্বালাও প্রথমেই টের পাওয়া যায় না। সাধারণ পোকামাকড়ের কামড়ের মতন মনে হয়।

বৃষ্টির বিরাম নেই। সারা পল্লিই এখন আবছা অন্ধকারে ঢাকা। আদিনাথের বাড়িতে একটা কুপিও জ্বলেনি। দাওয়ায় ওঠার আগেই তিনি হাঁক দিলেন, জগা, এই জগা!

চৌধুরীমশাই স্নান সেরে আসতে আজ কিছুটা দেরি করেছেন। জগা এই সময় তৈরিই থাকে, সে দৌড়ে এল এক ঘড়া জল নিয়ে। বড়মামার পায়ে জল ঢেলে হাত দিয়ে কচলে কচলে ভাল করে ধুয়ে দিতে লাগল সে।

একটা শুকনো গামছা দিয়ে চরণযুগল মুছতে মুছতে সে বলল, বড়মামু খবর শোনেছেন, রায়বাড়ির ঠাকুরদালান পর্যন্ত জল উঠে এসেছে।

আদিনাথ বললেন, হুঁ। তাঁর মাথায় এখন একটাই চিন্তা ঘুরছে, বিষ ঢালতে পেরেছে না পারেনি? যদি বিষক্রিয়া কিছু বোঝা না যায়, তা হলে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

জগা আবার বলল, এইবার আবার ভাসাবে।

বছর তিনেক আগেই তো বন্যা হয়েছিল এই অঞ্চলে। তার পরের বছরটা মোটামুটি ভালও না, খারাপও না। আর গতবছর তো দারুণ খরা। এ বছর বর্ষার ধরনধারণ দেখেই মনে হয়েছিল এমন বৃষ্টিতে নদীনালা ছাপিয়ে যাবে। গোটা শ্রাবণ মাসটা একদিনও বর্ষণ ব্যতীত কাটেনি।

তা, খরার থেকে বন্যা অনেক ভাল। বৃষ্টি হল আকাশের দান, যতই বৃষ্টি পড়ুক কখনও না বলতে নেই। মানুষ অপরাধ করলেই খরা হয়।

জগন্নাথ এই সময় নানান সংবাদ সরবরাহ করে। বিনা কাজে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়ানো তাঁর স্বভাব। আঙুল দিয়ে ডলে ডলে আদিনাথের পায়ের কাদা পরিষ্কার করতে করতে সে আবার বলল, রায়বাড়ি থেকে এক হালি কৈ মাছ ধরে এনিছি!

আদিনাথ অন্যমনস্কভাবে আবার বললেন, হুঁ।

তিনি দেখতে চেষ্টা করলেন ডান পায়ের গোছে রক্তচিহ্ন আছে কি না। দেখতে পেলেন না। বন্যা এদিককার মানুষের গা-সহা। খরার চেয়ে বন্যা বরং ঢের ভাল। বৃষ্টি হল আকাশের দান, যতই বৃষ্টি পড়ুক না কেন, বিমুখ হতে নেই। দেবতারা কোনও কারণে বিরক্ত হলেই মেঘ আর গর্ভিনী হয় না। নিশ্চয়ই মানুষের কোনও অপরাধই দেবতাদের বিরক্তির কারণ।

খরার সময় ফসল উৎপাদনে ক্ষতি হয়। পেটের অন্নে টান পড়ে। ফল-পাকুড়েও স্বাদ আসে না। আর বন্যার সময় মাছ পাওয়া যায় প্রচুর, জল সরে যাওয়ার পর নতুন পলি মাটিতে ফসল হয় দ্বিগুণ। গত বছর বন্যায় তেমন কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি, বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়নি। উঠোনে কোমর-জল থাকে কিছু দিন। কিন্তু মানুষকে গৃহহারা হতে হয় না।

রায়বাড়ির ঠাকুরদালান হচ্ছে সীমারেখা। সেখানে উপচে গেলেই কলকল করে জলের ধারা ছুটে আসবে গ্রামের মধ্যে। এ বাড়িতে রান্নাঘরটা দূরে বলেই কিছুটা অসুবিধে হয়। যাওয়া-আসা করতে হয় জল ঠেলে ঠেলে। তখন কিছু দিন পেছন দিকের আরও একটা দাওয়ায় নতুন উনুন পেতে রান্নাবান্না সারতে হয়।

জগন্নাথ বলল, কালকের ঝড়ে একটা নৌকা উল্টেছে তেতুলিয়ার বাঁকে। সে নৌকায় ছিল ভাদুড়ীদের নতুন জামাই। সে পশ্চিমা মানুষ, সাঁতার জানে না—

আদিনাথ বললেন, হয়েছে, এবার ভাল করে মুছে দে। আসন পেতে রেখেছিস? কোষাকুষি নিয়ে আয়।

দক্ষিণের কোণের ঘরটি আদিনাথের নিজস্ব। এ বাড়িতে আলাদা পুজোর ঘর নেই, আদিনাথের লম্বা ঘরটিরই শেষপ্রান্তে খানিকটা অংশে চ্যাঁচার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানেই রয়েছে পিতলের লক্ষ্মী-জনার্দন মূর্তি, একটা ক্যালেন্ডারের দুর্গা প্রতিমার বাঁধানো ছবি, আর তুলোট কাগজে দুটি আলতা মাখা পায়ের ছাপ, আদিনাথের বাবা ও মায়ের।

সেখানে আদিনাথ এসে বসলেন একটা বাঘের চামড়ার আসনে। এ আসনটি কেনা নয়, উপহার পাওয়া। মাঝে মাঝে দু'টো-একটা বাঘ ছিটকে ছাটকে চলে আসে এদিকে। আদিনাথ যখন কিশোর তখন একটা বাঘকে এ গ্রামের নমশূদ্ররা ঘায়েল করেছিল স্রেফ লাঠি পিটিয়ে। তাদের দু'জনও বাঘের থাবায় আহত হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণে মরেনি। মৃত বাঘটির ছাল ছাড়িয়ে, শুকিয়ে টুকিয়ে ঠিকঠাক করে সেটি নিবেদন করা হয়েছিল আদিনাথের বাবার শ্রীচরণে। সে আমলে সিদ্ধিনাথ চৌধুরী কাছাকাছি বেশ কয়েকটি গ্রামের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন এবং নমশূদ্রদের তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন।

সামনে কোষাকুষি নিয়ে, পদ্মাসনে বসে, পৈতেটি হাতে নিয়ে আদিনাথ একশ আটবার জপ করেন গায়ত্রী মন্ত্র। অন্য অনেক মন্ত্র বা শ্লোক জোরে জোরে উচ্চারণ করা গেলেও গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয় মনে মনে। এ অতি গুহ্য মন্ত্র। অব্রাহ্মণকে শোনানো নিষেধ। এমনকী উপনয়ন না হলে ব্রাহ্মণ সন্তানেরও এ মন্ত্রে অধিকার নেই।

একাগ্রতাতেই এ মন্ত্রের সাফল্য। কিন্তু আজ বারবার আদিনাথ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই দৃশ্য। গামছাটা খসে পড়ল, অমনি ছোবল মারল সাপটা। তাঁর পায়ে দাঁত বসেছিল? বোধহয় না। এখনই জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই নেই। হারামজাদাটা পারেনি তাঁকে মারতে।

গণনায় ভুল হয়ে যাচ্ছে। একশ আটবার না করে আসন ত্যাগ করা অনুচিত। তাই ভুল হলেই জেদ করে আদিনাথ আবার শুরু করছেন মাঝখান থেকে।

প্রায় শেষের কাছে এসে আদিনাথ অকস্মাৎ ডান পায়ে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন। যেন একটা মোটা গরম সুচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। অতি বড় সাহসী আদিনাথও কেঁপে উঠলেন একবার। হ্যাঁ, এইভাবেই তো শুরু হয়, তিনি জানেন। এই ব্যথা একটু একটু করে উঠবে উপরে, শেষ পর্যন্ত মাথায় পৌঁছলে নিশ্বাসেরও শেষ।

বেশ কয়েক মুহূর্ত আদিনাথ বিমূঢ়ের মতন বসে রইলেন। সত্যিই গোক্ষুর সাপের বিষ ঢুকেছে তাঁর শরীরে? এ সাপের বিষে কেউ বাঁচে না। তাঁর মরণ হবে এত অকিঞ্চিৎকরভাবে? একবার ওলাউঠা ও আরও একবার টাইফয়েডের মতন মারাত্মক রোগ দমন করে তিনি বেঁচে উঠেছেন, গত বছর দুর্গাপুজোর সময় মাদারিপুরের কাছে নৌকায় থাকার সময় তিনি ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলেন, তাঁর চোখের সামনেই তাঁর মামাতভাই মদন বর্শাবিদ্ধ হয়ে মারা গেল, তিনি অক্ষত অবস্থায় জলে লাফ দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপরেও নিছক একটা সাপের কামড়ে, এই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে...

আদিনাথ তাঁর শিরদাঁড়ায় একটা ঠান্ডা স্রোত অনুভব করলেন। ছাপ্পান্ন বছর, তাঁর কোষ্ঠিতে তো ঠিক এই বয়সেই একটা বৃহৎ ফাঁড়া আছে, মৃত্যুযোগ, তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন কী করে? সেই জন্যই আজ সাপটা অমনভাবে পড়েছিল সেখানে, ও যে সাক্ষাৎ নিয়তি! তিনি যে-বিদ্যুৎ চমকে সাপটাকে দেখতে পেয়েও পিছিয়ে গেলেন না, তিনি আত্মরক্ষার ঠিক মতন চেষ্টা করেননি, এ সবই নিয়তির টান।

তবু কি বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, নাকি কোনও লাভ নেই। চেষ্টা করবেনই বা কী? এ গ্রামে কেন, কাছাকাছি তিনখানা গ্রামের মধ্যেও কোনও চিকিৎসক নেই। চিকিৎসক থাকলেই বা কী হত, কালসর্পের বিষের কি কোনও ওষুধ আছে? প্রতিবছরই দু'তিন জন প্রাণ হারায়। পাশের গ্রামে আছে বনমালি ওঝা, তার ঝাড়ফুঁকে অনেকেরই কাজ হয়

না। দু'একজন বাঁচে। লাউডগা কিংবা জলঢোড়া, যেসব সাপের বিষ নেই, সেই সব সাপ যাদের কামড়ায় তাদের চিকিৎসা করে বনমালি ওঝা কেরামতি দেখায়। মুসলমান পাড়ায় একজন হেকিমের বেশ নামযশ আছে। কিন্তু তিনি বোধ হয় হিন্দু ব্রাহ্মণের শরীরে হাত ছোঁয়াতে রাজি হবেন না। যদিবা তিনি রাজি হন, এবং তাঁর চিকিৎসাতেও যদি প্রাণ রক্ষা করা না যায়, তা হলে মৃত্যুর সময় শুধুশুধু নিজের পরিবারের জাত-ধর্ম নষ্ট করা কি উচিত হবে আদিনাথের? তাঁর পুত্র-কলত্র দু'বেলা গালমন্দ করবে তাঁর নামে।

অতি দ্রুত এই সব চিন্তা করতে করতেও আদিনাথ হাঁক দিলেন, ওরে জগু, শিগগির আয়, দৌড়ে আয়।

জগন্নাথ কাছাকাছিই ছিল। হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, কী হয়েছে বড় মামা?

যাতে তাঁকে বেশি উদ্বিগ্ন আর অস্থির মনে না হয়, সেই জন্য তিনি বেশ কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস চেপে নীরব রইলেন। তারপর ধীর স্বরে বললেন, দড়াদড়ি যা পাবি আর কয়েকখান গামছা নিয়ে আয়। আমারে সাপে কাটছে, বাঁধন দিতে হবে।

আঁতকে উঠে জগন্নাথ বলল, সাপ? কোথায়? এই ঘরে?

আদিনাথ বললেন, না এখানে না। পুকুরের ধারে—

জগন্নাথ আবার জিজ্ঞেস করল, আপনে দ্যাখচেন সেটারে? জাইত সাপ?

আদিনাথ শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

বেশ কিছু ক্ষণ আগে যাকে বিষাক্ত সাপ কামড়েছে, সে কথা জেনেও যে-মানুষ এতক্ষণ কিছু বলেনি, সেরকম মানুষকে দেখলেও তো ভয় করে। জগন্নাথ একেবারে স্তম্ভিত।

আদিনাথ বললেন, খাড়াইয়া রইলি ক্যান, দড়ি-গামছা নিয়া আয়।

জগন্নাথ দৌড়ে গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে গগন-বিদারী চিৎকারে বলতে লাগল, ও মায়োইমা, ও বিশু, ও মানিক, ও ছোটু, সর্বনাশ হইছে!

এর মধ্যে কুপি জ্বলেছে রান্নাঘরে, অন্য দুটি ঘরে লণ্ঠন। আদিনাথ প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক সারার পর বাড়ির লোকেদের ডেকে নানা কথা বলেন, তার আগে কেউ তাঁর কাছে যায় না। এখন লুডো খেলার জন্য কয়েক জন জমায়েত হয়েছিল একটা ঘরে। সবাই ছুটে বেরিয়ে এল।

এই বৃষ্টির মধ্যেও সারা পল্লিতে ছড়িয়ে গেল আদিনাথকে সর্পদংশনের ভয়ংকর সংবাদ। বর্ষণ তুচ্ছ করে প্রত্যেক বাড়ি থেকেই লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁকে দেখার জন্য।

শিরে সর্পাঘাত হলে তাগা বাঁধার জায়গা পাওয়া যায় না। আদিনাথের ক্ষত হয়েছে পায়ে। বিষ উপরে উঠতে খানিকটা সময় লাগবে। ব্যথাটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। হাঁটুর উপর থেকে বাঁধন দেওয়া হয়েছে পাঁচটি, তার মধ্যে পেটের বাঁধনটি এতই আঁট যে চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে যেন। কয়েকজন ধরাধরি করে আদিনাথকে বিছানায় শুইয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, আদিনাথ রাজি হননি। এই অবস্থায় ঘুম এলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। আদিনাথ শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত জেগে থাকতে চান। বড় দাওয়া থেকে একটা আরামকেদারা আনা হয়েছে এই ঘরে, তাতে আদিনাথ বসেছেন পিঠ সোজা করে। ব্যথার কোনও রেশ পড়েনি মুখে।

নানা মুনির নানা মত, সকলেই কিছু না কিছু ওষুধ বা টোটকা জানে। কে কার থেকে বেশি জানে, তা নিয়ে মৃদু তর্কও বেঁধে যায়। কোথায় কে কবে সাপে-কাটা রুগি দেখেছে, সে গল্পও চলে আসে।

আদিনাথ সে সব কিছুই শুনছেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, জগু, তামাক দে।

বদি চাটুজ্জে এ পল্লিতে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। মাথার সব চুল পাটের মতন। ভুরু দুটিও পাকা। ধুতির উপর একটা তেলচিটচিটে ফতুয়া পরা। সবাই জানে, এই মানুষটি অতিশয় স্বার্থপর ও কৃপণ, তবু বয়সের কারণে তাঁকে সম্মান জানাতেই হয়।

জগু হুঁকো ও জলন্ত কল্কে আনার পরে আদিনাথ সেটা হাতে নিয়ে নিজে মুখে দেবার আগে বাড়িয়ে দিলেন বদির দিকে। তিনি কয়েকটা টান দেবার পর সেটা আদিনাথের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, একবার বনমালিকে ডেকে আনলে হয় না?

আরও কয়েকজন সম্মতি জানাল।

আদিনাথের মুখে এসে গিয়েছিল মুসলমান পাড়ার হেকিম সাহেবের কথা, শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ডাকা হোক বনমালিকে। কে জানে তাকে পাওয়া যাবে কিনা।

জোরে জোরে তামাক টানতে লাগলেন আদিনাথ। বেশ ধোঁয়া উঠছে বটে কিন্তু তিনি তামাকে কোনও স্বাদ পাচ্ছেন না। মুখটা তেতো তেতো লাগছে।

রেণুকা দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়াল ঘেঁষে। এত লোকের ভিড়ে তিনি কোনও কথাই বলতে পারছেন না। জগুর মা অন্যদের ঠেলেঠুলে কাছে এসে বললেন, আদি, একটু গরম দুধ খাবি? আইন্যা দিমু?

আদিনাথ দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

দিদি আবার বললেন, খা না। গায়ে বল পাবি। বৌমারে বলি?

আদিনাথ আবার মাথা নাড়লেন। মুখের তিক্ত স্বাদের জন্য তাঁর মনে হচ্ছে, দুধ টুধ খেলে বমি হয়ে যেতে পারে। এত লোকের সামনে!...

ঘরের লোকগুলোকে এখন দূর হয়ে যেতে বললে ভাল হয়, কিন্তু তা তো বলা যাবে না। এদের বকবকানি অসহ্য লাগছে।

তিনি ঠোঁটের দু'পাশের কষ মুছলেন একবার। তিনি জানেন, একসময় মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুতে শুরু করে। তার আগেই কি মুখের এই তিক্ত স্বাদ?

দিদি আর রেণুকার মুখে অসহায়তার ভাব ফুটে উঠেছে। যে-কোনও অসুস্থতায় মেয়েরা সেবা করতে চায়, সেবাই তাদের আন্তরিকতার প্রমাণ। কিন্তু সাপে-কাটা মানুষকে কী ভাবে সেবা করতে হয়?

মাঝে মাঝেই আদিনাথ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। ঘরের মানুষদের কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। এই সব ছেড়ে চলে যেতে হবে? কত কাজ বাকি আছে। কাল সকালেই তাঁর সুলেমানপুরে যাবার সব ব্যবস্থা করা আছে। সেখানে সবাই, পান্নারানি অপেক্ষা করে আছে। গত সাত মাস দেখা হয়নি, সে তরুণী মেয়েটির প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সদরে গিয়ে এ গ্রামে একটা পোস্ট অফিস বসাবার জন্যও দরবার করার কথা। মেজো ছেলেটো এখনও পৈতেয় গ্রন্থি দিতে শেখেনি। তাকে...। বৃষ্টি থামলেই রান্নাঘরের চালটা...। বন্যা যদি হয়ই, তা হলে আগেই রায়বাড়ির মন্দির থেকে সরাতে হবে বিগ্রহ।

কেটে গেছে দুটি ঘণ্টা। ঘরের মধ্যে ভিড় কিছুটা পাতলা হলেও কয়েক জনকে দেখে মনে হচ্ছে, তারা সারারাত বসে থাকবে, শেষ না দেখে যাবে না। বদি চাটুজ্জেকে তাঁর বাড়ির লোক ফিরিয়ে নিতে চাইলেও তিনি নারাজ। অনেক দিন পর এ পল্লিতে একটা কিছু ঘটনা ঘটছে, তিনি তার সাক্ষী থাকতে চান। এখন নিজেই তামাক টানছেন ঘন ঘন।

বনমালিকে যারা ডাকতে গেছে, তারা এখনও ফেরেনি, তবে এর মধ্যেও এলেন দু'জন অতিথি।

জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করছেন আদিনাথ, তবু তাঁর একবার ঝিমুনি এসে গেল। তিনি গা ঝাড়া দিয়ে আবার সোজা হলেন। কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকল, তিনি তাকালেন দরজার দিকে।

দিবাকর চট্টোপাধ্যায় আদিনাথের আবাল্য বন্ধু। অতি শৈশবে ধুলো কাদা মেখে খেলা করেছেন এর সঙ্গে, একই পাঠশালায় পড়েছেন, সর্বক্ষণ থাকতেন দু'জনে হরিহর আত্মার মতন। কিন্তু জীবনযুদ্ধে দিবাকর ঠিক সমান তাল রাখতে পারেননি বন্ধুর সঙ্গে। পুত্র সৌভাগ্য হয়নি, পাঁচটিই কন্যা, তাদের বিয়ে দিতে দিতে জমি-জমা সব খুইয়েছেন। বিবাহিতা মেয়েদের মধ্যেও দু'টি বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে, একেবারে ছোট মেয়েটির বিবাহ এখনও বাকি আছে। স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে দিবাকরের, আদিনাথের তুলনায় তাঁকে অনেক বেশি বৃদ্ধ দেখায়। দারিদ্রের কারণে এ গ্রাম ছেড়ে তিনি আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন পাশের গ্রাম চিতলমারিতে, শ্বশুরালয়ে। সে গ্রাম তিন ক্রোশ দূরে। এত রাতে, দুর্যোগের মধ্যে দুর্বল শরীরে তাঁর আসা মোটেই উচিত হয়নি।

তবু ছুটে এসেছেন বন্ধুর টানে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি ভাঙা গলায় বললেন, আদি আদি! তুই আমার আগে চলে যাবি? তা হবে না, কিছুতেই হবে না।

প্রায় ছুটে এসে তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন আদিনাথের পাশে।

আদিনাথ ফিসফিসিয়ে বললেন, তুই এ কী করলি দিবু? তোর শরীর ভাল না, কিছু দিন আগেই সান্নিপাতিকে ভুগেছিস।

দিবাকর বললেন, তুই যাবি না বল? আমার আগে যাবি না।

এই অবস্থাতেও আদিনাথ কোনও সান্ত্বনা কিংবা মিথ্যে স্তোকবাক্য শুনতে চান না। কুষ্ঠিতে লেখা আছে, নিয়তি তাঁকে টেনেছে। নিয়তি যে কখন কোন বেশে আসে, তা যে কিছুতেই বলা যায় না।

দিবাকরকে কিছুটা সাহায্য করার কথাও চিন্তা করেছিলেন আদিনাথ, যাতে তাঁর জীবিকা অর্জনের কিছু সুরাহা হয়, তারও ব্যবস্থা হচ্ছিল, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না।

তিনি বলতে চাইলেন, দিবু, তুই, তুই, সিরাজুল, সিরাজুল, কদমখালি, সৈয়দ সিরাজুল...

কথা আটকে যাচ্ছে আদিনাথের। মুখের তেতো স্বাদটা এখন একেবারে অসহ্য অবস্থায় পৌঁছেছে।

দিবাকরের সঙ্গে আর একজন কেউ এসেছে, তাঁকে চিনতে পারলেন না আদিনাথ। একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি, সাদা আলখাল্লার মতন কিছু একটা পরা, মুখে সাধু-সন্ন্যাসীদের মতন গোঁফ-দাড়ি। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন কোমরে হাত দিয়ে।

একটু পরেই, ঠিক ঘুম নয়, চোখে ঘোর লেগে গেল আদিনাথের। মানুষজনের কথার দু'একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন মাত্র, বাকি কিছু মর্মে ঢুকছে না। এক এক সময় মনে হচ্ছে যেন এসে গেছে বন্যা, বাইরে শোনা যাচ্ছে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। তামাকের ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর।

সেই ধোঁয়ার মধ্যে দু'জন মানুষ এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। বলে দেবার দরকার হয় না, দেখলেই বোঝা যায়, তারা যমদূত। দু'জনের মুখেই যদিও গালপাট্টা কিন্তু যাত্রাপালায় দেখা যমদূতের মতন মোটেই তাদের ভাবভঙ্গি বীভৎস কিংবা নিষ্ঠুর ধরনের নয়। তুলনায় একজনের বয়স বেশি, তার মুখখানি বেশ প্রশান্ত, অন্যজনও বেশ ঠান্ডা মতন।

বয়স্ক যমদূতটি বলল, চলো।

উত্তরটা জানেন, তবু আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

অন্য যমদূতটি বলল, যেখানে সকলকেই যেতে হয়।

আদিনাথ খানিকটা অভিমানের সুরে বললেন, এত তাড়াতাড়ি? আমার যে অনেক কাজ বাকি আছে।

বয়স্ক যমদূতটি হেসে বলল, সকলেই সেই কথা বলে। কিন্তু সময় ফুরিয়ে গেলে সব কাজই তুচ্ছ হয়ে যায়।

আদিনাথ বললেন, আমি যদি যেতে না চাই, তবু জোর করে নিয়ে যাবে?

অন্য যমদূতটি বলল, না, জোর করব কেন, তুমি নিজেই যাবে।

চলো, আমরা এই নীল আকাশের বুকে ভাসতে ভাসতে, কত ঝলমলে গ্রহ-নক্ষত্র পেরিয়ে চলে যাব। খুব ভাল লাগবে। সেখানে পৌঁছে দেখবে, এই শোক-ব্যাধি-জরার পৃথিবী ছেড়ে সে স্থান কত মনোহর। সেখানে চির শান্তি, চির আনন্দ। ওঠো আদিনাথ।

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে আমার মা আর বাবার দেখা পাব? আর পান্নারানি...

এ প্রশ্নের উত্তর পেলেন না আদিনাথ। হঠাৎ ঘরের মধ্যে অন্য কে যেন একজন চেঁচিয়ে উঠল, এই সরে যাও, সরে যাও, জায়গা খালি করে দাও—

তারপর কী যেন হতে লাগল, চমৎকার আরামে ভরে গেল আদিনাথের সারা দেহ। একটুও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, এমন সুখবোধ তিনি সারা জীবনেও অনুভব করেননি।

এর নাম মৃত্যু? তাহলে তো বারংবার মৃত্যু হওয়াই ভাল।

২

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে, ঘুমিয়ে আছে গ্রামবাংলা।

সবে মাত্র বৃষ্টি একটু ধরেছে, চতুর্দিকে নিঃশব্দ, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এই সময় কুকুরও ডাকে না।

এই পৃথিবী নামে গ্রহটিতে মানুষের বসবাস, কিন্তু সর্বত্র তো মানুষ মনুষ্যত্বের মর্যাদাটুকুও পায় না। কোথাও বিলাস-ব্যসন, সভ্যতার অগ্রগতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চা, আর কোথাও শুধু বেঁচে থাকাই প্রতিদিনের সমস্যা। এত মানুষ, পৃথিবীর কী প্রয়োজন এত মানুষের? প্রকৃতি অনবরত মানুষের মনে বংশবৃদ্ধির প্ররোচনা দিয়ে চলেছে,

আদিকালের তুলনায় একালে জনসংখ্যা হাজার-লক্ষগুণ বেশি, পৃথিবী কি এত মানুষের ভার বইতে সক্ষম? গাছপালা পশু-পাখি, মানুষের মধ্যে অবিরাম চলেছে বংশবৃদ্ধির যজ্ঞ, প্রকৃতিকে এ দায়িত্ব কে দিয়েছে? প্রকৃতি নয়, ঈশ্বর? সব কিছুই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তা হলে তাঁর সন্তানের মধ্যে এত বৈষম্য কেন?

গ্রামবাংলার এই সব অঞ্চলে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসলের প্রায় কিছুই পৌঁছয়নি। নেই আলো, নেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়। প্রতিদিনই ঘুম ভাঙার পর শুধু আহার্যের চিন্তা, রাত্রেও ক্ষুন্নিবৃত্তির পর কোনও ক্রমে ঘুমেই পরম সুখ। পশুর জীবনের সঙ্গে প্রায় কোনও তফাতই নেই, শুধু কেউ কেউ এরই মধ্যে গান গায়, কল্পনায় অলীক স্বর্গ গড়ে, কেউ নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে অন্য মানুষদের ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে, আবার কেউ একেবারে স্বার্থশূন্য হয়ে অন্য মানুষকে বাঁচাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। কেউ ভালবেসে আত্মক্ষয় করে, কেউ ভালবাসা চেনেই না।

চিতলমারি গ্রামটি এত রাত্রে একেবারেই নিস্তরঙ্গ, শুধুমাত্র একটি বাড়িতে জেগে আছে কয়েকজন। আলো জ্বালা নেই। কেরোসিনের দাম তো যথেষ্ট বটেই, রেড়ির তেলের খরচও বাঁচাতে হয়।

বাড়িটি জরাজীর্ণ, একটা লম্বা ঘরের মধ্যে পরপর বিছানা পাতা। একদিকের জানলা ভাঙা, প্রবল বৃষ্টির সময় কিছুতেই ছাট রোধ করা যায় না। ওপরের চাল থেকেও জল পড়ে। এখন অবশ্য বৃষ্টি থেমেছে। তবু পাশাপাশি শুয়ে থাকা তিন বোনের চক্ষে ঘুম নেই।

যখন বৃষ্টির তেজ খুব বেশি ছিল, তার মধ্যেই ওদের বাবা সকলের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু মুমূর্ষু, এই সংবাদ পেয়ে তিনি কিছুতেই বাড়িতে থাকতে পারেননি। এ মাসেই তিনি দু'বার জ্বরে ভুগেছেন, তার মধ্যে একদিন জ্বর এত বেড়েছিল যে, বেঁহুশের মতো প্রলাপ বকেছেন সারা রাত, সেই মানুষের কি আজ এমন বৃষ্টি ভেজা উচিত? অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়ে তিনি নিজেই না সে বাড়িতে কিছু বিপত্তি ঘটিয়ে বসেন।

এই সব অঞ্চলে খবর আদান-প্রদানের আধুনিক কোনও ব্যবস্থাই নেই। তবু যেন বাতাসে অনেক সংবাদ ছড়িয়ে যায়। বিশেষত, দুঃসংবাদ ঠিক ছড়িয়ে পড়ে, এমনকী গভীর রাতেও।

তিন বোনের মধ্যে দুর্গামণিই বয়সে সবচেয়ে বড়। সদ্য তিরিশ ছাড়িয়েছে। তার বিবাহিত জীবন মাত্র আড়াই বছরের। এ অঞ্চলে কাছাকাছি পাঁচ সাত খানা গ্রামের মধ্যেই বিয়ে শাদি সম্পন্ন হয়। তার বেশি দূরের খোঁজ খবর তো কেউ রাখে না। সেই তুলনায় দুর্গামণির বিয়ে বেশ দূরেই হয়েছিল, অন্য জেলায়, প্রথম কন্যার বিয়েতে সাধ্যের অতিরিক্তই ব্যয় করেছিলেন দিবাকর। পাত্রটি সরকারি চাকুরে, আদালতের মুহুরি। একান্নবর্তী পরিবার, প্রণামীর শাড়িই দিতে হয়েছিল চোদ্দোখানা। সে সুখ দুর্গামণির কপালে সইল না। বাড়িসুদ্ধ লোকের পান-বসন্ত হল, প্রথমেই মৃত্যু হল তার স্বামীর।

বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই স্বামী বিয়োগ হলে সব দোষ হয় স্ত্রীর, দু'দিন আগেও যে ছিল স্বামী-সোহাগি, সে এখন হল ভাতার-খাকি। বেন্টিঙ্ক সাহেবের আমলের আগে হলে এমন বৌকে অবশ্যই স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। রামমোহন রায়ের কথা এদিকে অনেকেই জানে না এবং আইন হওয়া সত্ত্বেও এখনও বালবিধবাকে নানা অত্যাচারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় বিরাম নেই। দুর্গামণির আরও দোষ, সে বাড়ির আরও পাঁচজনকে ওই মারাত্মক রোগে ধরলেও তার কেন হল না? যদিও দুর্গামণি তার স্বামীর সর্বাঙ্গে গুটি ওঠার সময়েও তার পাশে বসে সর্বক্ষণ সেবা করেছে, তবু মা শীতলা কেন তাকে দয়া করলেন না, তা কে জানে! সবাই উঠতে বসতে গঞ্জনা দিতে লাগল দুর্গামণিকে, সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত। অবস্থা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে, খবর পেয়ে দিবাকর মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। বাল-বিধবা একবার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এলে সে সংসারের সঙ্গে তার চিরকালের সম্পর্ক ঘুচে যায়। দুর্গামণি নিঃসন্তান।সেই তুলনায় তার পরের বোন শ্যামা স্বামীসঙ্গ করেছিল চার বছর এবং একটি পুত্র সন্তানের জননীও হয়েছিল। তার স্বামী ছিল স্টিমার ঘাটের টিকিটবাবু। লোকটি ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির এবং নেশাখোর। শ্যামাকে সে আদরযত্ন করত আবার চড়-চাপড়ও মারত মাঝে মাঝে। একজন গুড়ের ব্যাপারির সঙ্গে তার কী নিয়ে যেন কলহ হয়, সে কলহ অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়, তারপর হঠাৎ সে খুন হয়ে যায় এক রাত্রে। তার মৃতদেহ ভাসতে দেখা গিয়েছিল নদীর জলে।

তারপর এক মাস পুরতে না পুরতেই শ্যামার নিহত স্বামীর বড় ভাই প্রায় এক বস্ত্রে তাকে পাঠিয়ে দেয় বাপের বাড়ি। তার গয়নাগাটি যা ছিল তা দেয়নি, আর তার দু'বছরের ছেলেটিকেও রেখে দিয়েছে। গয়না গেছে গেছে, ছেলের জন্য এখনও কাঁদে শ্যামা। অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও সে আর ছেলেকে কাছে আনতে পারেনি। একবার সে একাই চলে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি, তাকে ভেতরে ঢুকতেও দেওয়া হয়নি, ছেলেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্য কোথাও। আর্ত গলায় সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে শ্যামা ছেলের নাম ধরে ডেকেছে, রাখু, রাখু, সোনা আমার আয়, আয়...। কিন্তু উত্তর পাবে কী করে, সে ডাক তো বাচ্চাটিকে শুনতেই দেওয়া হয়নি।

এ দেশের অনেক বালবিধবাদের তুলনায় তবু দুর্গামণি বা শ্যামার ভাগ্য কিছুটা ভাল। বাপের বাড়িতে কেউ তাদের কখনও গলগ্রহ বলে মনে করেনি। অনেক খরচাপাতি করে বিয়ে দেওয়ার পর সে মেয়ে যদি কিছু দিন পর নিঃসম্বল অবস্থায় ফিরে আসে, তবে অনেক বাপ-মায়েরই মুখ ভার হয়। ক্রমে সে মুখের চেহারাই বদলে যায়। কিন্তু দিবাকর আর সৌদামিনী অভাবের সংসারেও বিধবা মেয়েদের সস্নেহে আঁকড়ে ধরে আছেন।

আর দুই মেয়ে, তারামণি ও ননীবালা খুব সম্ভবত তাদের পূর্বজন্মের সুকৃতিতে এখনও স্বামী-শ্বশুরের সংসারে সেবাদাসী হয়ে টিকে আছে। গরিব ঘরের মেয়েরা বিয়ের পরে শ্বশুরের ঘরে গেলেও সহজে সে সংসারের কর্তৃত্ব পায় না। তারামণির স্বামীরা ছ'ভাই। তার স্বামী দ্বিতীয়, দোজবরে। বড়বৌ ইদানীং মাসের পর মাস রুগ্‌ণ, তবু সংসারের চাবি তৃতীয় বৌ সোহাগনলিনীর আঁচলে বাঁধা, কারণ তার বাবা সুদের কারবার করে, তারামণিকে তার মন জুগিয়ে চলতে হয়। ননীবালার স্বামী-শাশুড়ি এখনও দাপটের সঙ্গে জীবিত।

একেবারে কনিষ্ঠার নাম পদ্মরানি। সেও দিনদিন অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে।

বাবা-মায়ের খুব আশা ছিল, পঞ্চম সন্তানটি অন্তত ছেলে হবেই। তাও যখন হল না, তখন বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছিল। আর কোনও সন্তানের ইচ্ছেয় জলাঞ্জলি দিয়ে সেই শিশু কন্যাটিকেই সৌদামিনী অনেক দিন ছেলে সাজিয়ে রাখতেন। অন্য সমবয়সি বালিকারা যখন শাড়ি পরতে শুরু করেছে, তখনও পদ্মরানিকে ইজের আর গেঞ্জি পরানো হত। তার নামটিও হয়ে গেল পদ্মা, স্বভাবেও মেয়েলিপনা এল না। পড়শি বালকদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে গিয়ে সে মারামারিতে দিব্যি সমান-সমান হয়, গাছে চড়তেও সে ওস্তাদ। কিন্তু এখন পদ্মার বয়স সতেরো, এখন তো আর তাকে পুরুষ সাজিয়ে মনের সাধ মেটানো যায় না। তার ছটফটে স্বভাবটা সামাল দেওয়াই মুশকিল। এখন শাড়ি-সেমিজ না পরে বাড়ি থেকে বেরুনোই যায় না, নিন্দে করার জন্য জিভ লকলকিয়ে আছে পুরুষরা, অনেক বয়স্কা নারীও। অভাবের সংসার, তিন বোনকে অক্ষত শাড়ি-সেমিজ ভাগাভাগি করে পরতেই হয়। বিধবা দুই দিদি যাতে মনে কখনও আঘাত না পায়, তাই ছেঁড়া শাড়ি পদ্মা নিজে পরে, তবু দিদিদের দেয় না। আর সেই জন্যই সে বাড়ির বাইরে বেরোয় রাত্রিবেলা। সে নিশাচরী, তার ভয়ডর বলে কিছু নেই।

তিন বোনের মধ্যে খুব ভাব। এদের মধ্যে শ্যামার ব্যবহার কিছুটা অস্বাভাবিক, দিন দিন সেটা বাড়ছে। ছেলের জন্য তার মনটা আকুলিবিকুলি করে। তার ধারণা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ছেলে যদি মাকে না দেখতে পায়, তাহলে ছেলে মায়ের মুখ ভুলে যাবে, স্মৃতিতেও থাকবে না। তারপর একদিন মা আর ছেলেতে দেখা হয়ে গেল একটা অশ্বত্থ গাছতলায়, মা ছেলেকে চিনতে পারল না, আর মা-ও ছেলেকে...না, না, মা ছেলেকে চিনতে পারবে ঠিকই কিন্তু ছেলে যদি মাকে দেখে চক্ষু গরম করে বলে, এই মাগিটা কে, সর আমার সামনে থেকে? যদি তেমন হয়, তত দিন কি কোনও মায়ের বেঁচে থাকা উচিত?

সেই জন্যই শ্যামা এর মধ্যে একদিন পুকুরে ডুবে মরতে গিয়েছিল।

তিন বোন মিলে তাকে উদ্ধার করার পর পদ্মা বলেছিল, মাইমাদিদি, দেখিস তোর রাখুকে একদিন না একদিন আমি ঠিক নিয়ে আসব, এমনি না পারি চুরি করে নিয়ে আসব, এই আমার শপথ রইল। তোর ভাসুর

হারামজাদাটারে...

টানা বিছানায় শোয় তিন বোন, অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে। হাসেও খুব। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে মা বলে ওঠেন, ওরে, তোরা ঘুমাবি না? বাত্তি নিভা।

এক বোন উত্তর দেয়, বাত্তি নিভাইছি অনেকক্ষণ। এত তাড়াতাড়ি ঘুমাইলে ভাত হজম হবে না।

এক এক রাত্তিরে ওদের বাবাও এসে গল্প জুড়ে দেন।

কৃষিজমি সব হারিয়ে দিবাকর জীবিকার ধান্দায় ঘুরেছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে নিতান্ত ছোট কাজ করতে পারেন না, আবার বড় কাজের যোগ্যতাও নেই। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ অবশ্য বিশেষ জ্ঞান থাক বা না থাক, কথাবার্তায় তুখোড় হয়। সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে নানারকম ভুজুংভাজুং দিয়ে লোককে মোহিত করে রাখতে পারে, অন্তত কিছু দিনের জন্য। দিবাকর তাও পারেন না, তিনি নম্রভাষী, এতখানি বয়সেও লাজুক ধরনের। কথায় বলে, মুখচোরা বেশ্যা আর কেশোরুগি চোর, এদের জীবিকায় উন্নতির আশা নেই। চাকরিবাকরির ব্যাপারটাও তো একপ্রকার বেশ্যাবৃত্তিই বটে, তাই লাজুক লোকেরা সেখানে টিকতে পারে না।

জীবিকার অন্বেষণে ব্যর্থ হয়েছেন বটে, তবে ঘুরেছেন তো এই গ্রামের বাইরে নানা অঞ্চলে, তাই অভিজ্ঞতাও হয়েছে যথেষ্ট, দেখেছেন নানারকম মানুষ। সেই সব গল্প তাঁর মেয়েরা অবাক হয়ে শোনে। ধরা-গোবিন্দপুর নামে একটা গ্রামের মোড়ল হিন্দু, আর ধান-চালের পাইকার এক মুসলমান। দু'জনেই অবস্থাপন্ন, পরস্পর বন্ধুত্বও আছে, আবার দু'জনেই পাল্লা দিয়ে বিয়ে করে চলেছে। তবে একজনের চেয়ে অন্যজনের বৌয়ের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলেই কিছু দিন দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে যায়। দিবাকর যখন সেই ধরা-গোবিন্দপুরের পাঠশালায় কিছু দিন পড়িয়েছিলেন, তখন মোড়লের বৌয়ের সংখ্যা ছিল একত্রিশ আর পাইকারের বত্রিশ! আর একটি পাত্রীর খোঁজে মোড়লের তখন পাগল হওয়ার মতো অবস্থা।

এ গল্প শুনে তিন বোন একেবারে লুটোপুটি খায়। অনেক বাড়িতেই পুরুষদের দু'টি-তিনটি বৌ দেখতে তারা অভ্যস্ত, তা বলে একত্রিশ-বত্রিশ? কত বড় বাড়ি? কেমনভাবে সেই সব বৌয়েরা ঝগড়া করে?

এই হাসির মধ্যেই একসময় শ্যামা উঠে বসে উদাস গলায় বলেছিল, ওই হিন্দু মোড়লটা যদি হঠাৎ মরে, তাহলে একসঙ্গে একত্রিশটা মেয়ে বিধবা হবে, তাই না?

সেই সঙ্গে তার আর একটা কথাও মনে এল। মুসলমান পাইকারটি মরলে বত্রিশটা মেয়ে বিধবা হবে বটে, কিন্তু ওদের বিধবাদের আবার বিয়েশাদির হওয়ার দোষ নেই।

শ্যামা জানে, এমন কথা মনে এলেও উচ্চারণ করা পাপ। সে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে চলে যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত জাগলেও তিন বোনই জেগে ওঠে খুব ভোরে। বাড়ির কাজকর্ম তো তাদেরই শুরু করতে হয়।

অত সকালে ওঠার আরও একটা বড় কারণ আছে। রাত্তিরবেলা পেচ্ছাপ বাহ্যি করা বড়ই কষ্টকর। সন্ধ্যা-সন্ধি ওসব সেরে নিতে হয়। মাঝরাত্তিরে যদি বেগ পায়, তাহলে যত দূর সম্ভব কষ্ট করে তা চেপে রাখতে হয়, আর যদি অসহ্য হয়, তাহলেই বিপদ। একা যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ভূতপ্রেতের ভয় তো আছেই, তাছাড়া সাপখোপ, চোর ছ্যাঁচোড়, বদ মানুষদের উপদ্রবের ভয়ও কম নয়।

বাড়ির পেছন দিকে একটা প্রশস্ত দাওয়া, ভিত বেশ উঁচুতে, চার ধাপ সিঁড়ির নীচে উঠোন। তার একদিকে রান্নাঘর, অন্যদিকে একটু পিছিয়ে গোয়ালঘর। এ বাড়িতে একসময় একটি ধানের গোলাও ছিল, এখন সেটির ব্যবহার নেই, ভেতরে রাশিরাশি ইঁদুর হুটোপাটি করে। গোয়ালঘরে একটিমাত্র গরু ও তার সদ্য-জন্মানো বাছুর, তার পাশ দিয়ে সরু পথ, দু'পাশে অজস্র গাছগাছালি, বেশ কিছুটা গেলে একটি সরু খাল, তার উপরে বাঁশের মাচা, সেটি চ্যাঁচার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই খালটিই এ গ্রামের একমাত্র উন্নত স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার চিহ্ন। খালটি ঘুরে ঘুরে গেছে প্রত্যেক বাড়ির পিছন দিক দিয়ে, গৃহস্থরা তার উপর বাঁশের মাচা বেঁধে শৌচালয় বানিয়েছে। খালটি গিয়ে পড়েছে মাইল পাঁচেক দূরে চমকাই নদীতে। এই জন্যই মল-মূত্র-আবর্জনা আর পরিষ্কার করতে হয় না, সব নদীতে ভেসে যায়।

তবে ওই সব বাঁশের মাচা দিনের বেলা নিরীহ চেহারার হলেও রাত্তিরে অন্য রূপ ধরে। ভাদুড়ীদের বাড়ির অন্নদা ঠাইরেন এক রাত্রে একা একা বাধ্য হয়ে গিয়ে সবেমাত্র সেখানে বসেছেন, এমন সময় গর্তের তলা থেকে কে যেন বলে উঠল, দেঁ নাঁ, দেঁ নাঁ! জ্যোৎস্না রাত ছিল, স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল যে উঠে আসছে একটা লম্বা হাত। ভয় পেয়ে সেই অবস্থায় দৌড়তে গিয়ে অন্নদা ঠাইরেন আছাড় খেয়ে মাজা ভেঙে ফেললেন। তারপর আর বাঁচেননি বেশি দিন। সে-ও কত দিন আগেকার কথা, কিন্তু অন্নদা ঠাইরেনের গল্পটা এখনও এত জীবিত যে রাত্তিরে ওই মাচায় বসলেই কেউ কেউ আজও শুনতে পায় দেঁ নাঁ, দেঁ নাঁ। একা একা সেই ডাক শুনলে ভয় পাবে না, এমন বীর রমণী একজনও নেই!

এ বাড়ির লোকসংখ্যা কম নয়। একদিকের অংশ দিবাকরের দুই শালার, তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মিলিয়ে বেশ অনেকজন। সেই জন্য, ভোর হতে না হতেই সারারাতের আত্মপীড়নের পর যে আগে পারে ছুটে যায় মাচাঘরের দিকে।

আজ তিন বোন জেগে ছিল অনেকক্ষণ। বাবার প্রতীক্ষায়। তারপর ঘুম এসে গেছে অজান্তে। একসময় কীসের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল শ্যামার। সে চোখ মেলে দেখল, একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।

সে বলল, কে? কে ওখানে?

কোনও সাড়া নেই।

লম্বাটে চেহারা দেখে পদ্মা বলেই মনে হয়, তবু সে সাড়া দেবে না কেন? ততক্ষণে সে বেরিয়ে গেছে দরজার বাইরে।

পদ্মা কি বেগ সামলাতে না পেরে এখন খালধারে যাচ্ছে নাকি? একা? ও মেয়ে সব পারে।

ধড়মড় করে উঠে দিদিকে না ডেকে শ্যামা বেরিয়ে এল বাইরে।

একটা কুপি আর দিয়াশলাই রাখা থাকে রান্নাঘরে। রাত্তিরে যার যখন দরকার হবে, ব্যবহার করবে।

শ্যামা বাইরে এসে দেখল, পদ্মা রান্নাঘরের দিকেও না গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে খালের অন্ধকারের মধ্যে। এ কী হল? অনেক সময় ঘুমের মধ্যে মানুষকে বোবায় ধরে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে, মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করতে পারে না, ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটতে শুরু করে, অনেক সময় পুকুরধার পর্যন্তও চলে যায়। বিপদ হতে পারে কতরকম। আর আছে নিশির ডাক। কোনও ঘুমন্ত মানুষের নাম ধরে কেউ ডাকে, তখন যার নামে ডাক শোনা যায়, সে উঠে আসে বাইরে। তারপর সেই ডাক অনুসরণ করে সে কোথায় হারিয়ে যায়, কেউ জানে না।

শ্যামা দৌড়ে এসে দেখল, বাইরের রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে পদ্মা।

বৃষ্টিশেষের আকাশ এখন পরিষ্কার। বড় বড় গাছগুলির নীচে জমাট অন্ধকার থাকলেও এখানে সেখানে ফ্যাকাসে চাঁদের আলো পড়েছে। পথ চেনা যায়।

শ্যামা পেছন থেকে এসে পদ্মাকে জড়িয়ে ধরতেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মাথা রাখল দিদির কাঁধে।

তাতে এইটুকু অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে ওকে বোবায় ধরেনি। মুখ দিয়ে শব্দ বেরিয়েছে।

শ্যামা গভীর উদ্বেগে জিজ্ঞেস করল, কী হইছে, কী হইছে তর বুইনডি? কান্দোস ক্যান?

পদ্মা কান্না থামিয়ে সজল চক্ষে চেয়ে ধরা গলায় বলল, বাবায় কেন ফেরে না? আমি একখানা স্বপন দেখলাম...আমি আজই জ্যাঠার বাড়ি যাব।

বাবা এখনও ফেরেননি, খুবই চিন্তার কথা। তাঁর শরীর সুস্থ নয়। কিন্তু তারা মেয়ে হয়ে কী-ই বা করতে পারে? আদিনাথ জ্যাঠার বাড়ি অনেক দূর। এত রাতে দুই রমণীর পক্ষে সেখানে যাওয়া তো অসম্ভব কথা।

সে বলল, বাবা যতক্ষণ না ফেরে, চল আমরা ততক্ষণ জেগে বসে থাকি।

পদ্মা এবার অনেক স্পষ্ট গলায় বলল, তুই বসে থাক, আমি দেখে আসি, খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি...

শ্যামা পদ্মার একটা হাত ধরে বলল, খারাপ স্বপ্ন দেখলে অনেক

সময়ই তার উল্টো হয়। অত তরাস করিস না।

পদ্মা জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিতে-নিতে বলল, আমি ঠিক দৌড়ে চলে যাব। বাবার যদি সাহায্য লাগে।

শ্যামা বলল, না না, সকাল হতে দে।

পদ্মা এই বৈশাখে ষোলো ছাড়িয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে, সে আর কিশোরীটি নেই, তাকে জোর করে ধরে রাখা সহজ নয়। যার জেদ বেশি তার শারীরিক শক্তিও বেশি হয়।

দিদির হাত ছাড়িয়ে ছুটতে লাগল পদ্মা।

তখন অগত্যা শ্যামাও ছুটতে শুরু করল। একজনের চেয়ে দু'জনে একসঙ্গে থাকা তবু উচিত। ছোট বোনের কাছে এসে আবার তার হাত ধরে সে বলল, আমিও যাচ্ছি তোর সঙ্গে। আমার হাত ছাড়বি না। দৌড়স না, কুকুরে তাড়া করবে।

এ গ্রামে একটাও পাকা রাস্তা নেই। বর্ষাকালে কখনওই কাদা শুকোয় না। ওরা দু'জনে হাঁটতে লাগল পথের ধার দিয়ে ছায়ায় ছায়ায়।

এখন কত রাত কে জানে? চাঁদ মধ্য গগন পার হয়ে গেছে। সূর্যের তুলনায় চাঁদ তাড়াতাড়ি আকাশ পরিক্রমা করে। সূর্য দেখলে তবু সময় বোঝা যায়, চন্দ্রের আকাশ পরিক্রমা তো দেখার অভ্যেস নেই মানুষের। এমন নিশুতি রাতে শুধু জন্তু-জানোয়াররাই জেগে থাকে।

কুকুর তো আছেই। আর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে খট্টাশ আর শজারু। লোকে বলে খাটাইশ আর শ্যাজা। খট্টাশের গায়ে খুব দুর্গন্ধ, তাই যে-পুরুষ বেশিদিন স্নান-টান করে না, তাকে লোকে গালি দিয়ে বলে খাটাইশটা। আর শজারুর গায়ে বড় বড় কাঁটা, তারা দৌড়োলে ঝমঝম শব্দ হয়, যেন নাচুনি। গায়ে অত বড় কাঁটা থাকে বলে অন্য জন্তুরা শজারুর ধার ঘেঁষে না, কিন্তু এরা মানুষের কাছে অসহায়। শজারুরা গৃহস্থ বাড়ির আশেপাশে শাক-সবজি, মুলো, ঢ্যাঁড়শ প্রভৃতি খেতে আসে, মানকচু এদের বিশেষ প্রিয়। ঝুমঝুম শব্দ শুনলে অনেকে জেগে ওঠে। বিশেষত, ছেলে-ছোকরারা উৎসাহের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। শজারু ধরা খুব সোজা। কলাগাছের ছাল দিয়ে একবার ফোটাতে পারলেই কাঁটায় গেঁথে যায়, তখন আর তারা দৌড়তে পারে না। তারপর পিটিয়ে মেরে ফেলতে আর কতক্ষণ? এইসব ছেলে-ছোকরারা শ্যাজার মাংস খুব পছন্দ করে। যেমন নরম, তেমনই সুস্বাদু।

মেয়ে দু'টির দিকে মাঝে-মাঝেই কুকুরের দল তেড়ে আসে। কিন্তু খুব কাছে না এসেই ফিরে যায়। কুকুররা রাতের পাহারাদার। তাদের গন্ধশক্তিও খুব প্রবল, এক-দু'খানা গ্রামের প্রত্যেক মানুষের গায়ের গন্ধ তারা চেনে। সেই চেনা গন্ধ পেলেই থেমে যায় তাদের চ্যাঁচানি।

শেয়াল আর কুকুরের চেহারা প্রায় এক। শুধু কুকুরের তুলনায় শেয়ালের মুখ সুঁচোলো আর ল্যাজ মোটা। আর তাদের ল্যাজ সবসময় ঝুলে থাকে। মানুষকে আক্রমণ করার সাহস শেয়ালের নেই, হাঁস-মুরগি চুরি করতেই তারা ওস্তাদ। কুকুর শেয়ালের চিরশত্রু, কিন্তু এইমাত্র দুটো শেয়াল রাস্তার এ পাশ থেকে ছুটে চলে গেল, কুকুরের ডাক শোনা গেল কিছুটা দূরে, আক্রমণ করতে এল না। বড় দল না থাকলে কুকুররা শেয়ালদের ভয় পায়।

এ গ্রামের কুকুরগুলো ক্যাংলা ক্যাংলা। মাঝের গাঁয়ের অতুল গোস্বামী বিদেশে কাজ করে, বছরে একবার-দু'বার তার মাকে দেখতে আসে গ্রামে। সে একবার একটা কুকুর সঙ্গে করে এনেছিল। সাত-আট মাসের মধ্যেই কী বিশাল তার চেহারা হল, আর কী গম্ভীর ডাক! ওসব নাকি সাহেবদের দেশের কুকুর। তার ভয়ে কুকুর-শিয়াল সব মাঝের গাঁ ছেড়ে পালাল। মানুষও ধার ঘেঁষে না। অতুল গোস্বামী আবার বিদেশে চলে যাওয়ার পর খুব বিপত্তি হল সে কুকুর নিয়ে। অত বড় কুকুরকে কে সামলাবে? নমোপাড়ার বদনকে সব শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন অতুল গোস্বামী, কিন্তু একবার সে কুকুরের গলা থেকে লোহার চেন খুলে যাওয়ার পর তাকে আর ধরার সাধ্য রইল না বদনের। সে সারা গ্রাম দাপিয়ে বেড়ায়। লোকের মুখে মুখে তার নাম হয়ে গিয়েছিল বিলিতি কুকুর। কোনও বাড়ির কাছাকাছি দেখা গেলেই লোকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

অবশ্য কোনও মানুষকে কামড়ানোর চেষ্টা সে করেনি।

একদিন এই মাঝের গাঁ ছাড়িয়েও আরও দু'-তিন গাঁয়ের লোকজন ছুটে এসেছিল বিশেষ একটা দৃশ্য দেখার জন্য। দেখার মতোই বটে।

এখানে গ্রামের এক জায়গায় অনেকখানি মাটি ধসে গিয়েছিল আগের বর্ষায়। সৌভাগ্যের বিষয়, ঠিক সেখানে কোনও ঘরবাড়ি ছিল না। একটু দূরে, দু'দিকেই পর পর বাড়ি। ধসের জায়গাটায় অনেকখানি জুড়ে একটা খোঁদলের মতো হয়ে গেল। সেখানে সবাই যাবতীয় ময়লা ফেলে, তবু সবচেয়ে কাছে ঘোষাল বাড়ি বলে লোকের মুখে মুখে জায়গাটার নাম হয়ে গেল, ঘোষাল বাড়ির আদাড়।

পরের বর্ষার শুরুতেই সেখানে গজিয়ে উঠল ছোট ছোট গাছ। জল উঠে এলে সে গাছের ক্ষতি হয় না। সেই স্বল্প জলে চিড়িক চিড়িক সূর্য পোকা, খুরকুনা মাছ, কেউ কেউ নাকি বেলে মাছও দেখেছে।

একদিন সকালে সেখানে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃশ্য। সেই আদাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বাঘের মতো চেহারার বিলিতি কুকুর, গর-র গর-র আওয়াজ করছে, তার উল্টো দিকে রয়েছে একটা বেড়াল আর একটা গোসাপ। গোসাপটি বেশ বড়, বাচ্চা কুমিরের মতো, গায়ের রং সোনালি। গ্রামের লোক বলে গুইসাপ, যদিও সকলেই জানে যে সাপের সঙ্গে এই প্রাণীটির কোনও সম্পর্ক নেই। হাঁ করলে খানিকটা ভয়াবহ দেখায় বটে, কিন্তু মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। বরং গুইসাপের চামড়ার বেশ ভাল দাম পাওয়া যায়।

কুকুরটা একটু এগোবার চেষ্টা করতেই গোসাপটি হাঁ করছে, আর বিড়ালটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে ভয় দেখাচ্ছে। এরকম চলেছিল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। খাল পাড় একেবারে ভিড়ে-ভিড়াক্কার। পদ্ম আর শ্যামা দু'জনেই সেবারে দেখতে এসেছিল অন্যদের সঙ্গে মিশে।

কুকুরটা কি গোসাপটাকে খেতে চেয়েছিল? গোসাপটার তুলনায় বিড়ালটাকেই যেন ভয় পাচ্ছিল বেশি। সব কুকুরই বিড়ালকে ভয় পায়, এমনকী বিলিতি কুকুরও। সাধে কি আর বিড়ালকে বাঘের মাসি বলে?

গোসাপটার সঙ্গে বিড়ালটার হঠাৎ অমন বন্ধুত্ব হল কী করে? দু'টি প্রাণীই একই গ্রামের বাসিন্দা বলে? মানুষের তো গল্প বানাতে দেরি হয় না। সব জনতার মধ্যেই দু'-একজন কাহিনির জনক থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রটে গেল যে, বিলেত থেকে কুকুর এসেছে অত্যাচার করতে, তাই এদেশি প্রাণীরা এককাট্টা হয়ে লড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে। এখন দেখা যাক, কে জেতে কে হারে।

সকলকে নিরাশ করে কিছুক্ষণ পরেই সে যুদ্ধ মাঝপথে থামিয়ে কুকুরটা নেমে গেল খালের জলে। কেন কে জানে। ভেসে গেল অনেক দূর। তারপরই গল্পের নবতম সংযোজন। ব্যাটা হেরে গিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে একেবারে পগার পার। সাঁতরে সাঁতরে সোজা পৌঁছে গেল বিলেতে। কোন খাল-বিল, নদী-নালা পেরিয়ে সে সাগরে গিয়ে পড়বে, তা বলা অতি দুষ্কর। তবে পরদিন থেকে সে কুকুরকে আর যে সে অঞ্চলে দেখা যায়নি, তাও ঠিক।

দুই বোন যত দূর সম্ভব নিঃশব্দে হাঁটছে। শ্যামা আশা করছিল, এর মধ্যেই সে বাবাকে দেখতে পাবে। দিবাকরকে তো ফিরতে হবে এই পথেই। এখনও ফেরার নাম নেই। খুব গুরুতর কিছু হলে হারু কিংবা জগাকে দিয়ে বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে পারতেন না? কিংবা হয়তো তার চেয়েও গুরুতর কিছু ঘটেছে, যে জন্য খবর পাঠানোরও কাউকে পাওয়া যায়নি।

ঘোষাল বাড়ির সেই আদাড় এসে গেছে, এখন একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে খাল পেরোতে হবে। আর বেশি দেরি নেই।

সাঁকোটা বেশ দোলে। একদিকের ধরুনিটা মাঝখানে ভেঙে গিয়েছিল, এখন দড়ি বেঁধে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত যারা পারাপার করে, তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে, নতুনদের ভয় তো লাগবেই।

পা টিপে টিপে আসছে দুই বোন, সামনে শ্যামা। মাঝখানে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে ঠান্ডা হয়ে এল তার হাত-পা। এতক্ষণ পায়ের দিকেই নজর ছিল বেশি, সামনে তাকায়নি। এবারে চোখে পড়ে গেল, সাঁকোটা যেখানে শেষ হয়ে এসেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। পুরুষ মানুষই, হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা। তার মুখ উল্টো দিকে ফেরানো। শ্যামাদের এখনও দেখেনি, সাঁকো পার হওয়ার কোনও ব্যস্ততাও নেই।

তাহলে, এত রাতে কোন পুরুষ সাঁকোর কাছে হাওয়া খেতে আসবে?

শ্যামা থেমে গিয়ে তার বোনকে বলল, দেখেছিস? চল, চল, ফিরে চল শিগগির।

পদ্মাও দেখেছে ঠিকই। তবু সে বলল, ফিরে যাব কেন?

শ্যামা আতঙ্কিত ভাবে বলল, তোর কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না? এত রাত্রে...পুরুষ মানুষ, শিগগির শিগগির ফের।

পদ্মা বলল, আমি বাবাকে একবার স্বচক্ষে না দেখে কিছুতেই বাড়ি ফিরব না। ভয়ের কি আছে? মানুষ তো!

শ্যামা বলল, মানুষ কিনা তাই বা কে জানে! আর মানুষকেই তো বেশি ভয়।

পদ্মা বলল, তুই ফিরে যা। তোর আর আমার দরকার নেই। আমি ঠিক ঘুরে আসব।

শ্যামা বলল, তুই পাগল হয়েছিস? আমি তোকে একা ছেড়ে দেব? মরতে হলে দু'জনে একসাথে মরব। না না, ভুল কইলাম, তেমন কিছু হলে আমি মরব, তুই ততক্ষণে পালাবি, আমার তো জীবনের কোনও দাম নেই।

পদ্মা বলল, যাবি তো চল! মরব কেন? ওই লোকটার যদি কোনও বদ মতলব থাকে, আমরা দু'জনে মিলে ওর চোখ গেলে দেব!

এক-পা দু'-পা করে আবার এগোতে লাগল শ্যামা। অনেকটা আপন মনেই বলল, আমরা তো কখনও কারও ক্ষতি করি নাই, তবে অন্য লোকে আমাদের ক্ষতি করবে কেন বল?

পদ্মা তার দিদির মতো সহজ মানুষ নয়। এমন সরল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে চুপ করে রইল।

আর খানিকটা যেতেই কী যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল। তারপর বোঝা গেল, সেটা একটা গানের গুন-গুনানি।

তাতে খানিকটা আশ্বস্তবোধ করল শ্যামা।

তাহলে ভূত-প্রেত কিছু নয়। ভূত তো গান গাইতে পারে বলে শোনা যায়নি। ওরা তো নাকি সুর ছাড়া কিছু উচ্চারণই করতে পারে না।

তারপরই আর একটা প্রশ্ন তার মনে এল। যদি মানুষ হয়, তাহলে যে মানুষ একা একা দাঁড়িয়ে গান করে, সে কি খারাপ মানুষ হতে পারে?

এটা সে ফিসফিস জিজ্ঞেসই করে ফেলল বোনকে।

এ প্রশ্নেরও উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত না হতে পেরে পদ্মা বলল, হতেও পারে, নাও হতে পারে।

সাঁকোটার মধ্য পথ পেরিয়ে আবার দুই বোনই প্রায় একসঙ্গে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, সুরেশ্বর!

হ্যাঁ, ঠিকই তো, সে রাত্তিরে একা একা ঘুরে বেড়ায়। হয়তো বৃষ্টিতেও ভিজেছে!

এই অঞ্চলে সুরেশ্বরই একমাত্র অনাত্মীয় পুরুষ, যাকে মেয়েদের ভয় পাবার কোনও কারণই নেই। বরং মেয়েরা পছন্দই করে তাকে। তার মাথার দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্যবহার বড় নরম। সে একটা মালকোচা মারা ধুতি আর গেঞ্জি পরে আছে। এটাই তার সব সময়ের পোশাক।

বাকি অংশটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে এসে শ্যামা ওর হাত ধরে বলল, উফ্, কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি! তুই এখানে কী করছিলি রে বোম্ ভোলা?

সুরেশ্বর বলল, দাঁড়িয়ে আছি।

শ্যামা বলল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন দাঁড়িয়ে আছিস? আর কেউ আসবে? খুব তো ভিজেছিস, তাই না?

সুরেশ্বর বলল, কিছু না।

শ্যামা আবার জিজ্ঞেস করল, তোদের গ্রামের খবর জানিস? আমি চৌধুরীর বাড়িতে...

এর উত্তরে সুরেশ্বর যা বলল, তার মর্ম কে বুঝবে? শিশুর মতন সরল ভাবে সে বলল, আজ তো বেস্পতিবার, আজ তো আমি কোনও খবর পাই না। কিছুই খবর বুঝি না। এই অঞ্চলের সবাই সুরেশ্বরের মুখে এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত। এরা খুব অবাক হল না। পদ্মা ওর পিঠ ছুঁয়ে বলল, কাকু, তুমি আমাদের সাথে একটু যাবে?

একটুও আপত্তি না করে সুরেশ্বর হাঁটতে শুরু করল।

এদিকটায় কাদা আরও বেশি। একজন আর একজনের হাত না ধরে থাকলে আছাড় খাবার সম্ভাবনা।

ওরা তিনজনই হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। ঘোর রাত্রি, খালের এ পাড়ে বাড়িঘরও কম, কেউ দেখার নেই, তবু দুটি যুবতী ও একজন যুবকের পরস্পরকে ধরে ধরে হেঁটে যাওয়া একটি অভিনব দৃশ্য তো বটেই। এই রাস্তায় ইতিহাসে প্রথম।

মানিকের এ সময় ঘুমিয়ে থাকার কথা। ওদের মৃদু কথাবার্তা ও পা ফেলার আন্দাজে কী একটা পাখি একটা তেঁতুল গাছ থেকে কর্কশ ভাবে ডেকে উঠল। পাখি না, বাদুড়।

কেন তারা এত রাতে রাস্তায় বেরিয়েছে, যেন তার একটা কৈফিয়ত দেওয়া দরকার, সেই জন্য শ্যামা বলল, জানিস রে ভোলা, আমার বাবার খুব অসুখ।

আদিনাথ চৌধুরী বেঁচে আছেন কি না, তা নিয়ে শ্যামা বা পদ্মা তেমন চিন্তিত নয়, ওদের উদ্বেগ ওদের বাবার জন্য। আপন আর পরের মধ্যে এই তফাত তো হয়ই।

কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার বলে যে মানুষ কোনও খবরই পায় না, শ্যামার কথা শুনে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে?

সে শুধু বলল, ও তারপর সে আবার তার থামিয়ে দেওয়া গানটা শুরু করতে যেতেই পদ্মা বলল, না কাকু, এখন গান গেও না। ভাল লাগছে না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলা। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেল দুটো ছোটখাটো আলোর গোলা। তারা? উল্কা? কী জানি কী!

তারও একটু পরে খানিক দূরে শোনা গেল অনেক মানুষের এক সঙ্গে কথা। ওই দিকেই আদিনাথ চৌধুরীর বাড়ি, দিবাকরের মেয়েরা কয়েকবার এসেছে কিছু উপলক্ষে।

শ্যামা আর পদ্মা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দূরাগত মানুষদের কলকণ্ঠ কান্নার কি না, তা অবশ্য বোঝা গেল না। তবু বিপদের সম্ভাবনায় বুক কাঁপে। জেদের সঙ্গে এত দূর চলে এসেও পদ্মা নিজেও একটু গুটিয়ে গেল। একবার ইচ্ছে হল, ওদিকে ছুটে যেতে, আবার মনে হল, শোকের বাড়িতে এমন ভাবে যাওয়া কি মানায়? সে শুধু শাড়ি জড়িয়ে আছে গায়ে। সেমিজ নেই। শাড়িটাও কয়েক জায়গায় ফেঁসে গেছে।

কেন যেন দিবাকর সম্পর্কে তার ভয় অনেকটা কেটে গেছে।

শ্যামা সুরেশ্বরকে বলল, ভোলা, তুই একবার দৌড়ে যাতো, ওই বাড়ি থেকে খবর নিয়ে আয়।

সুরেশ্বর বলল, বেস্পতিবার।

শ্যামা বলল, মরণ আমার! তুই মস্করা করছিস আমাদের সাথে? ঠিক আছে, তোকে খবর আনতে হবে না। তুই যা, ওখানে গিয়ে যা দেখবি, ফিরে এসে আমাদের তাই-ই বলবি। যা, লক্ষ্মী সোনা, যা তোকে তক্তি খেতে দেব। আমরা এইখানে থাকছি

সুরেশ্বর বলল, তক্তি?

তারপরই সে এই কাদার মধ্যেই বিস্ময়কর বেগে ছুটে গেল।

শ্যামা পদ্মাকে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হাতে এক গোছা পাট কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে সুরেশ্বরের সঙ্গে হেঁটে আসছেন দিবাকর। মেয়ে দুটি দৌড়ে গিয়ে তাঁর দু'পাশে দাঁড়াল। দিবাকর খুব কাশছেন, মেয়েদের দেখে খুশি হয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। হাসলেন।

৩

দিন চারেক শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন আদিনাথ। ডান পাটা ফুলে রইল গোদের রুগিদের মতন। সেখানে স্পষ্ট দুটো দাঁতের দাগ। এ দাগ চিনতে ভুল হবার কথা নয়। তবু যে তিনি বেঁচে গেলেন, তা প্রায় অলৌকিক কাহিনির পর্যায়ে পড়ে।

মাঝির সমস্যা মিটে গেছে, কুটিশ্বর এখনও বেশ অসুস্থ, কিন্তু আদিনাথ চৌধুরীর বিশেষ দোস্ত জনাব কাশেম আলি তালুকদার নিজের নৌকোয় ঝালোকাঠি যাচ্ছেন, তিনিই সুলেমানপুর নামিয়ে দেবেন তাঁকে। আবার দিন সাতেক পর ফেরার। ঝালোকাঠিতে তালুকদার সাহেবের মায়ের কুলখানি হবে।

কী হয়েছিল সেই রাতে?

এর মধ্যেই গ্রামে গ্রামে দু'তিন রকম গল্প ছড়িয়ে গেছে।

সে ঘরে অন্তত সাত-আটজন মানুষজন ছিল, ঘটনা তো ঘটেছিল একটাই, তবু বিবরণ সম্পর্কে ওই ক'জন একমত হতে পারে না।

বদি চাটুজ্যে ও তাঁর দু'একজন সঙ্গী নাকি স্বচক্ষে দেখেছে যে, আদিনাথ চৌধুরীর এক সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন ঘরের মধ্যে একজন অচেনা মানুষ এসে ঢোকে, সাদা আলখাল্লা পরা, সে আর সবাইকে চুপ করিয়ে আদিনাথের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে কী একটা মন্ত্র পড়তে থাকে। তাতেই কিছুক্ষণ পরে আদিনাথের জ্ঞান ফিরে আসে ও চোখ মেলে তাকায়। তারপর সেই মানুষটিকে আর দেখা যায়নি। কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় চলে গেল, কেউ জানে না!

আর একটি কাহিনিতে স্পষ্ট মহাভারতের যযাতির কাহিনির প্রভাব। সেই সাদা আলখাল্লা পরা লোকটি নাকি চেঁচিয়ে বলেছিল, এর বিষ এখনও মাথায় ওঠেনি, একে বাঁচাবার একটিই উপায় আছে। এর কোনও সন্তানকে মুখ দিয়ে বিষ টেনে নিতে হবে। সময় লাগবে, ধৈর্য ধরে একটু একটু করে টানতে হবে বিষ। কোন ছেলে সে দায়িত্ব নেবে?

আদিনাথ চৌধুরীর পাঁচ সন্তান। একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে শৈশবেই, অন্য মেয়েটি বিবাহিতা। বড় ছেলে তিলক চাঁদও বিয়ে করে দু'টি সন্তানের জনক, দ্বিতীয় ছেলে বিশ্বেশ্বর এখনও বিয়ে করেনি, ধর্ম-কর্মের দিকে তার খুব ঝোঁক, আর ছোট ছেলে মানিকচাঁদ, তার বয়েস উনিশ।

সেই আলখাল্লাধারী প্রথমে তিলকচাঁদকে এই প্রস্তাব দিতেই সে প্রায় কেঁপে উঠে বলল, আমি? আমি? আমি ছেলেমেয়ের বাবা, মুখে সাপের বিষ নেব স্বেচ্ছায়? আমার ছোট ভাইরা থাকতে? লোকে বলবে কী?

বিশ্বেশ্বর ঠান্ডা মাথায় বলল, বাবাকে বাঁচাবার জন্য আমি এ কাজ অবশ্যই করতে রাজি ছিলাম। কিন্তু আমি জানি, কারুর মুখে যদি ঘা থাকে, ফুস্কুড়ি থাকে, তা হলে এই বিষের ছোঁয়া লাগলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে। কী তাই না? আপনিই বলুন, ক'দিন ধরে আমার খুব কাশি হয়েছে, কাশি হলে গলার মধ্যে ক্ষত হয় না? তবু যদি...

মানিকচাঁদকে এ প্রস্তাব দিতে সে কোনও প্রশ্নই করল না। বরং দুই দাদার দ্বিধা দেখে সে নিজেই এগিয়ে আসছিল। বাবাকে আগে প্রণাম করে সে ক্ষতস্থানে মুখ দিল। কয়েকবার থুঃ থুঃ করে পুঁজ রক্ত বাইরে ফেলল সে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই চোখ মেললেন আদিনাথ, মানিকচাঁদও দড়াম করে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। অবশ্য তার চোখে মুখে জল দিতেই ...

যে এই গল্পটি রটিয়েছে তার রসবোধ আছে। মানিকচাঁদের সঙ্গেই তার বাবার সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ। সে মোটেই পিতৃভক্ত নয়। বাবা-ছেলের ঝগড়া হয় প্রায়ই, মাসখানেক আগে আদিনাথ একদিন এই অবাধ্য ছেলেকে অনেকের সামনেই চাবুক দিয়ে পিটিয়েছেন।

মানিকচাঁদ নিজেও এ কাহিনি অস্বীকার করেছে তার বন্ধুদের কাছে। তার মতে, ঘরের মধ্যে নানান রকম লোক ছিল, কেউ একজন ওই রকম একটা কথা বলেছিল বটে, তাতে কেউ পাত্তা দেয়নি। ওরকম ভাবে, ঠোঁট দিয়ে টেনে সাপের বিষ মানুষের শরীর থেকে বার করা যায় নাকি? যত সব গাঁজাখুরি কথা। আমার বাপ বেঁচে রয়েছে, তার ছোট ছেলেটাকে আরও শায়েস্তা করবে বলে!

আদিনাথ নিজে যা বলেছেন, তা শুনে তাজ্জব হতে হয়। এটা তিনি সত্যিই বিশ্বাস করে বলেন, না তাঁর নিজস্ব কৌতুক, তা বলা শক্ত। তিনি বলেন, তিনি এক মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান হারাননি, সব তাঁর মনে আছে। এক সময় যমরাজা তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন। তারা অতি ভদ্র, তারা তাঁর অশরীরী আত্মাটা নিয়ে গেল আকাশে, শরীরটা পড়ে রইল ঘরের মধ্যে। নীল আকাশে ভাসতে ভাসতে এক সময় তিনি পৌঁছে গেলেন স্বর্গের সিংহদুয়ারে। সেখানে রায়বাবুদের খাজাঞ্চিখানার চেয়েও অনেক বড় একটা ঘরের মধ্যে কাজ করছেন কুড়ি-তিরিশ জন কর্মচারী। আর মা দুর্গার পাখার মতন এক একটা পাতার সাইজ, একটা জাবদা খাতা নিয়ে বসে আছেন চিত্রগুপ্ত। তার কিন্তু মাথায় টাক, আগে শুনেছিলাম স্বর্গের কোনও দেবতার মাথায় টাক পরে না, তা কিন্তু ঠিক নয়।

তিনি তো সব দেখে শুনে যমদূত দুটোকে বকুনি দিয়ে বললেন, এ তো ভুল লোককে এনেছ। কুলতলির হাটের বদন চৌধুরীকে আনার কথা, যাও যাও। একে ফিরিয়ে দিয়ে এস!

আমি তখন হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করলাম, প্রভু, আমাকে যখন

দয়া করে ফিরিয়ে দিলেন, তখন আর একটু দয়া করুন, আপনার ওই খাতা দেখে বলে দিন, আমার আর কত দিন আয়ু আছে?

তখন তিনি ধমক দিয়ে বললেন, যাও যাও ছোকরা, বিরক্ত কোরো না। দেখছ না আমার কত কাজ। তোমার এখনও ঢের ঢের দেরি আছে।

কাশেম আলি তালুকদারের নৌকোয় ছইয়ের বাইরে বসে তামাক টানতে টানতে এই কাহিনি শোনাবার পর আদিনাথ সগর্বে বললেন, তার মানে, বুঝলে তালুকদার, আমি একশো বছর অন্তত বাঁচব। একবার ভুল মৃত্যু সংবাদ রটলে এমনিতেই মানুষের আয়ু দ্বিগুণ হয়ে যায়।

কাশেম আলি হাসতে হাসতে বললেন, তা বোধহয় তুমি পারো। শোনো চৌধুরী, তোমার শরীরে সাপের বিষ ঢুকেছে তো ঠিকই, সেইজন্যই বোধ করি তোমার মুখ চোখের জেল্লা অনেক বেড়ে গেছে! আর একটা শাদি করে ফেলবে নাকি?

এরপর দুই বন্ধুতে বিশ্রম্ভালাপ করলেন কিছুক্ষণ। একটু পরে দাবা নিয়ে বসা হল।

কাশেম আলি তালুকদার আদিনাথ চৌধুরীর তুলনায় বেশ বিত্তবান ও প্রভাবশালী মানুষ, কিন্তু আদিনাথের সঙ্গে তিনি দাবা খেলায় এঁটে উঠতে পারেন না।

সুলেমানপুরে নেমে আদিনাথ বেশ খানিকটা দমে গেলেন।

বিষধরের কামড় খেয়েও তিনি যে বেঁচে আছেন এটাই শ্বশুরবাড়িতে প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন, তা কিন্তু হল না। তাঁর তরুণী পত্নী পান্নারানি গর্ভবতী এবং আসন্নপ্রসবা, এর মধ্যে একদিন ব্যথা উঠেছিল ভোরবেলা, সে কি ছটফটানি, দাইকে ডেকে আনতে আনতে দু'ঘন্টা কেটে গেল, কিন্তু সেদিন কিছু হল না।

আদিনাথের শ্বশুর ভবানীচরণ, আদিনাথের চেয়ে বয়েসে দু'এক বছরের ছোটই হবে। বোধহয় তিনি এই সব কথাই বলতে লাগলেন বারবার। আদিনাথের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কোনও গুরুত্বই দিলেন না। অবশ্য আদিনাথের খাতির-যত্নের কোনও অভাব হল না, একটি দাসী তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে পান-তামাকের ব্যবস্থা করল ঠিকঠাক।

পান্নারানি এখন রয়েছে তার মায়ের ঘরে। আদিনাথ একবার তার সঙ্গে দেখা করে এলেন। স্বামী-স্ত্রীর নিভৃতে কথা বলার সুযোগ নেই, পান্নারানি কাঁদতে লাগলেন খুব, প্রথম প্রসবের সময় সব মেয়েই ভয় পায়।

আদিনাথের শ্বশুর-পক্ষ বেশ অবস্থাপন্ন, বাড়ির কিছুটা অংশ পাকা দালান। আদিনাথকে দেওয়া হল দক্ষিণ দিকের একটি ঘর, এর জানলা দিয়ে একটা পুকুর দেখা যায়। আদিনাথের বেশ পছন্দ হল। দুপুরবেলা দশ রকম ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৃপ্তি করে সে সব খেয়ে, পান মুখে দিয়ে, চুন সুদ্ধু পানের বোঁটাটি ধরে, খাটে বসে আদিনাথ কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

গণনা করে দেখলে ঠিক সাত মাস চব্বিশ দিন আগে তিনি এখান থেকে গিয়েছিলেন বরিশাল। তার আগে এখানে কাটিয়েছেন ন'দিন বা দশ দিন, সেই সময়, হ্যাঁ, আদিনাথের স্পষ্ট মনে আছে, অন্তত তিনবার পান্নারানির সঙ্গে তাঁর সহবাস হয়েছিল। মোটামুটি আট মাসই ধরা যাক। আট মাসে কি সন্তান হয়?

হতেও পারে, অসম্ভব নয়, তবে সাধারণত ন-দশই লাগে। আটাশে ছেলে বলে না?

পান্নারানির এই অবস্থা, আগে একটা খবর দিতে পারেনি? ভবানীচরণ বললেন বটে যে একটা পোস্টোকার্ড পাঠিয়েছিলেন, হ্যাঁ, একটা পোস্টোকার্ড এসেছিল ঠিকই। তাঁদের গ্রামে পোস্ট অফিস নেই, চিতলমারিতে চিঠিপত্র আসে, সেখান থেকে নিয়ে আসতে হয়, একমাত্র মানি অর্ডার এলে পিওন বাড়ি বয়ে দিতে আসে, কারণ তখন বখশিস পাবে ঠিক জানে। অথবা গ্রামের একজন লোক গিয়ে অন্য যার যার চিঠি পায়, তাও নিয়ে আসে।

মুশকিল হচ্ছে ভবানীচরণ শিক্ষিত লোক, বিদ্যে ফলাবার জন্য তিনি চিঠি লেখেন ইংরেজিতে। আদিনাথকে সে চিঠি পড়াবার জন্য লোক খুঁজতে হয়। বাড়িতেই আছে অবশ্য একজন, তাঁর ছোট ছেলে মানিক, কিন্তু সে ছেলেটা হয়েছে ঘাড় বেঁকা। গত কয়েক মাস ধরে সে ছেলের সঙ্গে ভাল করে কথাই হয় না।

হঠাৎ আদিনাথের কপালে কয়েক বিন্দু ঘাম জমে উঠল। হাতের কর গুনতে লাগলেন। সাত মাস না আটমাস? অথবা, অথবা, সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ বাড়িতে পান্নারানির গোটা তিনেক মামাতো ভাই আছে, কার্তিক কার্তিক চেহারা, যদি সে রকম কিছু....

আদিনাথ যে-ধরনের মানুষ, একবার মনের মধ্যে একটু সন্দেহের স্ফুলিঙ্গ জ্বললে তা তিনি চাপা দেবার পাত্র নন। কিন্তু এখন কেন যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। পান্নারানি ভাল মেয়ে, তার নামে অযথা সন্দেহ করা উচিত নয়। তিনি নিজেই তো ঘন ঘন আসতে পারেন না, তার জন্য সে কত অভিমান করে.... না না, এমন কথা মনে আনাই উচিত নয়।

মামাতো ভাই তিনটে কাজকর্ম কিছু করে না, খোদার খাসির মতন ঘুরে বেড়ায়, আবার নাটক, যাত্রা থিয়েটার করে। এই সব ছেলেদের নীতিবোধ থাকে না। আদিনাথের বাড়িতে এরকম নিষ্কর্মা শালারা এসে দিনের পর দিন থাকতে শুরু করলে তিনি দূর করে দিতেন।

আদিনাথ শুয়ে পড়লেন, কিন্তু দিবানিদ্রার আরাম ভোগ করতে পারলেন না। ঘুম তো এলোই না, বিছানায় একবার এপাশ, আবার ওপাশ। ভাবতে চান না, তবু ভেবে চললেন, সাত, না আট? একেবারে টায় টায় আটমাস হলেও কি...

বিকেল গেল, সন্ধে গেল, রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় বসে তামাক টানতে টানতে হঠাৎ তার মনে একটা সাঙ্ঘাতিক চিন্তার উদয় হল।

ধরা যাক, পান্নারানি অসতী। কথায় বলে, আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখতে নেই, যে-কোনও সময় মনের অজান্তেও একটা লঙ্কা-কাণ্ড হয়ে যেতেই পারে। মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনে নটো-খটো হওয়া তো বিশ্বসংসারে একেবারে নতুন কিছু নয়। এখানে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা অনেকে জেনে ফেলেছে। চাপিয়ে দিচ্ছে তাঁর ঘাড়ে। নিখুঁত আয়োজন, কেউ কিছু মুখ ফুটে বলতে পারবে না।

আদিনাথ যদি রাগারাগি করেন, তাতেই বরং লোকে হাসবে। যে পুরুষ নিজের বৌকে সামলে সুমলে রাখতে না পারে সে তো মাগের গোলাম। তার পৌরুষের ওপর থুতু ফেলবে লোকে।

এখন কী করবেন আদিনাথ? সন্তানটি যত দিন না জন্মায়, তত দিন বসে থাকবেন এখানেই? বাঙালির সব সময় জিভ লক লক করে, তত

দিনে এ খবর আরও ছড়াবে। মজা দেখতে কাছাকাছি আত্মীয়রাই ছুটে আসবে নিশ্চয়ই। আর যখন বাচ্চাটা পৃথিবীতে এসে ট্যাঁ ট্যাঁ করবে, তখন তারা আড়ালে হাসাহাসি করতে করতে বলবে, হতভাগা বুড়ো, বৌয়ের নাঙের ছেলের মুখ দেখছে!

ভোর হবার আগেই আদিনাথ মনস্থির করে ফেললেন।

রাগারাগি করলেন না একটুও, যেন তাঁর মনে সন্দেহের কণামাত্র ঢোকেনি। অসম্ভব সংযমের সঙ্গে শান্ত গলায় বললেন, যে তিনি এবার দশ-পনেরো দিন থাকার জন্য মনস্থ করে এসেছিলেন, কিন্তু একবারও মনে পড়েনি যে, এর মধ্যে তাঁর একটা দেওয়ানি মামলার তারিখ আছে। বাড়ি থেকে কাগজপত্র সব নিতে হবে, বড় ছেলেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে, কারণ ওর শ্বশুরের টাকায় সাড়ে তিন আনা জমি কেনা হয়েছিল....। রাগের প্রকাশ নেই, কিন্তু আদিনাথের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা রয়েছে ঠিকই। ভবানীচরণ বুঝতে পারলেন, ওঁকে আর টলানো যাবে না। তবু দু' একবার ক্ষীণ ভাবে অনুরোধ করে নিরস্ত হলেন।

কাশেম আলির নৌকো ফেরার জন্যে অপেক্ষা করলেন না আদিনাথ। একটা নৌকো কেরায়া করে ফেললেন।

দুপুরবেলার ভোজন না সেরে বেরুলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। আদিনাথ খেতে বসলেন বটে, কিন্তু তাঁর ক্ষুধা নেই, মুখখানা আমসিপানা হয়ে আছে, এমনকী বড় বড় গলদা চিংড়ির মুড়ো ভর্তি বাটিতে তিনি হাতও ছোঁয়ালেন না। নারকোল কোরার পায়েস তার বিশেষ প্রিয়, তাও পড়ে রইল অস্পৃষ্ট। গেলাসের জল তিনবার জিভে ছুঁইয়ে তিনি স্বাহা, স্বাহা স্বাহা বলে উঠে পড়লেন।

বিদায় নেবার জন্য একবার দেখা করতে এলেন পান্নারানির সঙ্গে। আজও কেউ তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর নিভৃতি দিল না। মায়ের বিছানায় শুয়ে আছে পান্নারানি, মা পাশে বসে পান সাজছেন, দরজার কাছে বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা, তাদের মধ্যে মামাতো ভাইগুলোও আছে কিনা কে জানে।

আজও পান্নারানির দু' চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে জলের ধারা। এ কান্নার কী তাৎপর্য কে জানে। মুখে কোনও কথা নেই।

শিয়রের কাছে এসে আদিনাথ তার মাথায় হাত দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, ভয় নেই, ভয় নেই কিছু। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। শ্রাবণ মাসে জাতকের কোনও বিপদ হয় না। বিশেষ দরকারে আমি চলে যাচ্ছি। আবার আসব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আদিনাথ মনে মনে অবশ্য বললেন, বিদায় হারামজাদি। আর এই বাড়িতে আমি কোনও দিন থুতু ফেলতেও আসব না। এখন তুই তোর নিজের ভাগ্য বুঝে নে।

ফেরার পথে আবার জোর বৃষ্টি। আদিনাথ ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শখ করে বৃষ্টি ভিজলেন। তাঁর সর্দি-কাশির ধাত নেই, বৃষ্টি ভিজলে তিনি আনন্দ পান।

বুকটা তবু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পান্নারানিকে কি তিনি ভালবেসেছিলেন? ভালবাসা ঠিক কাকে বলে? নিজের মতো করে সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়াটাই ভালবাসা? শাস্ত্রে আর কাব্যে তো অনেক কথাই আছে, বাস্তবে আসল ব্যাপারটা কী?

পান্নারানি একটি কথাও বলেনি। শুধু কাঁদছিল। কিছু কি বলার ছিল তার? আসল ঘটনাটা কেউ জানাল না? হঠাৎ খুব রাগ হল ভবানীচরণের উপর। ইংলিশে পোস্টোকার্ড! বিদ্যে ফলানো? আদিনাথও সংস্কৃতে লিখলে ও কিছু বুঝতে পারত?

গ্রামে এবার একটা পোস্টাফিস বসাতেই হবে।

৪

কথায় আছে, ধারায় শ্রাবণ, পচা ভাদ্র। সেই ঝমঝমানি বৃষ্টি আর নেই, এখন মাঝে মাঝেই টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে, কখন শুরু হয়, কখন শেষ হয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আর ভরসা করে ডালায় বড়ি শুকোতেও দেওয়া যায় না।

জমা জল রায়বাড়ির ঠাকুরদালান ছাপিয়ে ওঠেনি, তাই এ বছর আর বন্যা হল না। তবে বৃষ্টির পরিমাণও কম নয়। অনেক পুকুরেই জল উঠে এসেছে পাড়ে। তাই বাচ্চাদের খুব আনন্দ, তারা খালি হাতেই পুঁটি, খয়রা, বাঁশপাতা, ল্যাটা মাছ ধরে ফেলে। এর মধ্যে ল্যাটামাছ ব্রাহ্মণদের খেতে নেই, তা শিশুরাও জানে, সেগুলো তুলে তুলে ফেলে ছুঁড়ে দেয়। সবচেয়ে আনন্দ হয় কই মাছ পেলে।

চৌধুরীদের বাড়ির আদি পুকুরটাই বলা যায় কই-মাগুরের আড়ত, তবে মাগুররা কখনও নিজে নিজে জল ছেড়ে স্থলে ওঠে না। কোনও বাড়িরই নিজস্ব পুকুর থেকে বাইরের বাচ্চারা এসে মাছ ধরলে আপত্তি করে না কেউ। কিন্তু গাছ থেকে আম পাড়তে গেলেই বকুনি খেতে হয়।

মানিক বড় পুকুর থেকে ছিপ ফেলে একটা কালবোস মাছ ধরেছে সের দেড়েকের। এ মাছ বড় মিষ্টি। সহজে ধরা পড়ে না। মানিকের আজকের মতন সংসারের জন্য উপার্জন হয়ে গেছে। তাকে তো প্রায়ই শুনতে হয়, অকর্মার ঢেঁকি, কামের নামে দেখা নাই, শুধু বসে খাই খাই ইত্যাদি।

আজ জ্যান্ত মাছটা এনে উঠোনে ফেলে জগুকে বলল, আমার বাপকে যখন খাওয়ার সময় মুড়োটা দিবি, তখন যেন দুই তিনবার বলিস, মাছটা আমি ধরেছি। বলবি তো? তুই ল্যাজাটা খাস।

জগন্নাথ আদিনাথ চৌধুরীর খোদ ভাগনে হলেও তাকে তিনি নিজস্ব খিদমদগার করে নিয়েছেন। জগন্নাথের মা নিভাননীর ওপর রান্না-বান্নার সব ভার। কিন্তু তাঁকে এই সংসারের কিংবা আলমারির চাবি দেওয়া হয়নি।

এই সংসারে একজন জবরদস্ত গৃহস্বামী আছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনও গৃহিণী নেই। আদিনাথের স্ত্রী ভাগ্য ভাল নয়। প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়ের সাত বছরের মধ্যে মারা যায়, বড় ছেলে দ্বিজনাথ সেই পক্ষেরই সন্তান। পরের স্ত্রী রেণুকাও দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, তারপর তাঁকে সেই যে সূতিকা রোগে ধরল, একেবারে কাহিল হয়ে গেল শরীরটা, এখন অধিকাংশ সময়ই শয্যাশায়ী থাকেন। এর মধ্যে আবার হাঁপানিতে ধরেছে। আর তৃতীয়-স্ত্রী পান্নারানির তো ওই অবস্থা দেখে এলেন।

সুলেমানপুর থেকে ফিরে এসে আদিনাথ কয়েকটা দিন ফের থম মেরে ছিলেন। কারুর সঙ্গেই কথা বলেননি। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে অমন তেজস্বী মানুষটাও কোথায় অসহায়। শারীরিক ভাবেই তাঁর বুকের সামনের দিকের যে শূন্যতা তা ভরে দেবার মতন কেউ নেই। তাঁর শরীরের এখনও প্রচুর ক্ষুধা, কিন্তু খাদ্য কোথায়?

আদিনাথ সুলেমানপুর থেকে ফিরে এসে সেখানকার কথা কিছুই বলেননি রেণুকাকে। রেণুকা অসুস্থ হতে পারে, বুদ্ধিহীনা তো নন। কিছু একটা বুঝেছেন ঠিকই।

একদিন তিনি মধ্যরাত্রে কোনও ক্রমে নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন। তিনি ইচ্ছে করেই মেঝেতে বিছানা পেতে শোন, আদিনাথ পালঙ্কে, নইলে কাশির দমক এসে স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। সেদিন তিনি স্বামীর দু'পায়ে মাথা রেখে কান্না শুরু করতেই আদিনাথ ধড়মড় করে জেগে উঠে বললেন, কী হয়েছে? ব্যথা করছে?

রেণুকা কিছু না বলে কেঁদেই চললেন।

আদিনাথ উঠে বসে বললেন, ব্যথা বেড়েছে খুব? পুরান্ ঘি মালিশ করে দিতে হবে? ননীকে ডাকি, দাঁড়াও।

আদিনাথের কণ্ঠে বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

রেণুকা তাকে বোঝালেন যে তার নিজস্ব ব্যথা নয়, তার একটা অপরাধ বোধ হচ্ছে। তিনি তার স্বামীর জন্য কিছুই করতে পারছেন না। শরীরটা শুকিয়ে গেছে, রস নেই, তবু তাঁর স্বামী কখনও তাঁকে অবজ্ঞা করেন না। অযত্ন হতে দেন না। এ জন্য তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আদিনাথ রেণুকার শীর্ণ শরীরটা খুব কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ওসব কথা বলতে নেই। যার যা নিয়তি। রেণু, আমি চাই, আমি যত দিন বাঁচব, তুমিও তত দিন থাকো আমার কাছে। শোওয়ার সময় তোমাকে একবার দেখি, দুটো-একটা কথা বলি, তাতেও শান্তি পাই।

রেণুকা বললেন, আমার একটা অনুরোধ শুনবেন? আপনি আর একটা বিয়া করেন। তবে এবারে বৌরে বাপের বাড়ি থুইয়া না এসে তাকে ঘরে নিয়ে আসেন। আমি তার অনেক আদর যত্ন করব, রোজ তার চুল বেঁধে দিব, পায়ে আলতা পরাব, আপনারা এই ঘরেই থাকবেন।

উত্তরের ঘরটা পড়ে আছে, আমি শোবো সেখানে।....

আদিনাথ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, ওসব কথা এখন থাক। অনেক রাত হয়েছে যে, এখন ঘুমাও। শান্তিতে ঘুমাবার চেষ্টা কর।

রেণুকা আবার বললেন, আমার আর একটা প্রার্থনা, ছোট ছেলেটারে আপনি দয়া করেন। আপনি তারে শুধু শাস্তি দেন, তারে মানুষ করে তোলার দায়িত্বও তো আপনের। সে আপনারে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। কালবউস মাছটা ধইরা আইল্যাই কইলো, মুড়াটা যেন বাবাকে দেওয়া হয়। আরও কতবার...

আদিনাথ বললেন, রেণু, আমার সবকটা ছেলেমেয়ের মধ্যে মাইনকার প্রতিই যে আমার সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা, তা তুমি বোঝো না? অবাধ্য সন্তানের প্রতিই পিতা-মাতার টান থাকে বেশি। ও আমার কোনও কথাই শোনে না। কিছুই মানতে চায় না। ওর বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে, কয়েক জায়গায় পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি, তোমার ছেলে তো সে কথায় কান দিতেই চায় না। তুমি বরং একটু বুঝিয়ে বলো...

রেণুকা বললেন, আমি বলেছি, কিন্তু ও এখনই বিয়ে করতে রাজি নয় কিছুতেই। আগে জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

আদিনাথ এবার ঈষৎ উষ্ণ স্বরে বললেন, সে চেষ্টাও কি আমি কম করেছি। ল্যাখাপড়া শিখেছে, জমি-জমার কাজ দেখা শোনা করা ওর পোষায় না, তাও আমি বুঝি। কিন্তু রায়বাড়িতে আমি ওর কাজ ঠিক করে দিয়েছিলাম, সে কাজও ও নিল না। অনেক ভাগ্যবলে একই গ্রামের মধ্যে এরকম কাজ পাওয়া যায়, জমিদার বাড়ির কাজে খাতির কত, সে কাজ যে হেলা-তুচ্ছ করে সে একটা মূর্খ ছাড়া কি? ভারি তো ল্যাখাপড়া শিখেছে। একেবারে শেষ পরীক্ষায় সে ফেল মেরেছে। তুমি জানো? একেবারে ডাহা ফেল। নিজেকে মনে করে বিদ্যাদিগগজ। দামড়ার মতন ঘুরে বেড়ায়।

এইরূপ আলোচনা কিছুক্ষণ চলার পরই অকস্মাৎ মেঘগর্জন শুরু হল। আজ আবার বৃষ্টি ঢালবে। তখনই জানলা-দরজা বন্ধ করার জন্য হাঁকডাক শুরু হয়ে যায়।

মানিক পারতপক্ষে তার বাবার সামনে আসে না।

বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে চট করে সরে যায়। দূরে কোথাও গিয়ে বসে থাকে। বাবা অবশ্য মাঝে মাঝেই ডাক পাঠান তাকে। কিছু না কিছু কাজে দায়িত্ব দিতে চান, মানিকের শুধু এক কথা, সে শহরে গিয়ে আরও পড়াশুনো করতে চায়। আদিনাথ তাতে কিছুতেই রাজি নয়। গ্রামে তো আর পড়াশুনো সম্ভব নয়, বাইরে কোথাও গিয়ে পড়তে গেলেই তো পয়সা লাগে, থাকার জায়গা লাগে। অত পয়সা আদিনাথের নেই। কারুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রিত থাকতে গেলেই তো অনেক সময় নানান অপমানের মুখোমুখি হতে হয়। উচ্চবংশে জন্ম হলে কি সেই সব অপমান মেনে নেওয়া সম্ভব?

গিয়েছিল তো মাদারিপুরে, কী লাভ হল?

নিয়ামতপুরে আদিনাথের এক জ্যাঠার বাড়ি। জ্যাঠা বেঁচে নেই, সে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। তবু এক নেমন্তন্ন বাড়িতে জ্যাঠতুতো ভাই হরিমোহনের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় ছেলেদের পড়াশুনোর কথা উঠতেই হরিমোহন বলেছিলেন, আদি, তোমাদের গ্রামে তো ইস্কুল নেই, তা ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিও আমার ওখানে। আমার বাড়ি একেবারে হট্টমন্দির, যে ইচ্ছে আসে, থাকে, খায়। আর এলেম থাকলে কিছু পড়াশুনোও করতে পারে। সেখানেই চলে গিয়েছিল মানিক। নিয়ামতপুর থেকে মাদারিপুর খুব কাছে নয়, মাইল চারেক হেঁটে যেতে হত স্কুলে। আশ্রয় বাড়িটিতে অনেক মানুষজন, কেউ ঠিক অপমান-গঞ্জনা দেয়নি ঠিকই, দিয়েছে উদাসীনতা। মানিক নামে একটি ছেলে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশে আছে না নেই, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এক একদিন খাবারও জুটত না কিছু। বয়েসে বড় সোমদত্ত নামে একটা ছেলে এক একদিন নিজের খাবারের ভাগ দিত মানিককে, লেখাপড়াতেও কিছু সাহায্য করত। আর রাত্তিরবেলা মানিককে জড়িয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ হাত বুলাত সারা গায়ে।

মন দিয়েই পড়াশুনো করতে চেয়েছিল মানিক। কিন্তু ও বাড়িতে সম্ভব হল না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে গিয়ে বাবার পায়ে ধরতে হয়েছে অনেকবার, তবু, দুঃখের কথা, সে ইংরিজি আর অঙ্কে ফেল করে গেল!

তবু মানিক আবার পড়তে চায়। সে এবার কলকাতায় যাবে। যেমন করে হোক, যাবেই যাবে।

আজ মাঝের গাঁয়ে হাটবার। সকালে বাজার বসে, বিকেলে হয় হাট। কিন্তু যে গ্রামে বাজারই নেই, সেখানে সপ্তাহে দু'বার হাট বসে যায়, ব্যাপারিরা সকাল সকালই আসতে শুরু করে, বিকেল ফুরোতে না ফুরোতেই হাট ভেঙে যায়। কারণ আলোর ব্যবস্থা নেই। দূরের ক্রেতারাও ফিরে যায় আগে আগে।

মানিক আর তার বন্ধু যোগীশ্বর নিয়মিত হাট দেখতে যায়। তাদের যে খুব একটা কেনাকাটার থাকে তা নয়, এ বাড়ির দরকারি আনাজপত্র জগুই কিনে আনে। অনেক কিছু বাড়িতেই হয়। মানিকরা হাটে যায় শুধু দেখার জন্য, হাটে কত রকম মজা। এই গত মাসেই একটা বোয়াল মাছ উঠেছিল, সেটা কত বড়, প্রায় এক মানুষ সমান? অত বড় মাছ কে কিনতে পারে? এখন ইলিশ উঠেছে ভাল, দু' পয়সা দু' আনায় একখান সরেস ইলিশ পাওয়া যায়। ও বোয়ালের খদ্দের জুটবে না। একজন বলল, মাছটাকে নিলামে দিতে। মাছওয়ালা রাজি নয়। নিলামে যত কম দরই উঠুক, তাকে দিয়ে দিতে হবে। রায়বাবুদের বাড়ির কেউ আসেনি, নিলামে বেশি দর হাঁকার হিম্মৎ আর কার আছে? অত বড় মাছ, কত কষ্ট করে ধরতে হয়েছে, অন্তত দুটো টাকা না পেলে সে মাছটাকে শিয়াল-কুকুরকে খাওয়াবে, তবু কারুকে দেবে না।

মানিক তখন মাছওয়ালা অছিমুদ্দিকে বুদ্ধি দিয়েছিল, লটারি দাও।

লটারি মানে কী? মানিক বলল, সকলকে ডেকে বল, এক আনার টিকিট কাটতে। কারুকে দর হাঁকতে হবে না, ওই এক আনার লটারিতে যে জিতবে, সে পাবে ওই মাছ। কোথা থেকে একটা পুরোনো কাগজ জোগাড় করে তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক এক টুকরোয় এক, দুই লেখা হল। নতুন ধরনের ব্যাপার, তাই সারা হাটে রীতিমতন চাঞ্চল্যের অবস্থা, সেই এক আনার টিকিট বিক্রি হল আটচল্লিশ খানা, তার মধ্যে দু'জন আবার সেই ছোট্ট কাগজ ট্যাঁকে রাখতে গিয়ে ফেলল হারিয়ে।

এক ঘণ্টা পর সব কাগজের টুকরো একটা ধামায় রেখে, উলট পালট করে দিয়ে বৃদ্ধ রহিমুদ্দি, যে চোখে ভাল দেখতেই পায় না, তাকেও চোখ

বন্ধ করে তুলতে বলা হল একটা কাগজ।

তার পর সেটা হাতে নিয়ে মানিক হাসি মুখে চেয়ে রইল সবার দিকে।

বত্রিশ নম্বরের টিকিট, ওই রহিমুদ্দিরই ছেলে সেলিম পেয়ে গেল সেটা। একজন কেউও এখানে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন তুলল না, কারণ রহিমুদ্দির সততা সন্দেহের উর্ধ্বে। দু' তিনজন বোকা লোক অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে গুনগুনিয়ে বলতে লাগল, আমরা কিছু পেলাম না। কিছু পেলাম না?

আর অনেক বুঝদার মানুষ লটারি ব্যাপারটা সমর্থন করে বলতে লাগল, এইডা বেশ ভাল, একখান আনি খরচ করে অনেকক্ষণ আশায় আশায় থাকা যায়। মালটা না পেলেও অল্প পয়সায় তো আশা কেনা যায়।

অছিমুদ্দির লাভ আশাতীত, সে দু' টাকার বেশি পাবে ভাবেনি। সে মানিককে বাট্টা দিল দু'আনা, স্বেচ্ছায়। যোগীশ্বর টিকিটের নম্বর লিখেছিল বলে সেও পেল এক আনা।

সেদিনকার হাটেই দু' জন সাহেব-মেম দেখা গিয়েছিল।

সাহেবরা দেশের রাজা, কিন্তু এই সব গ্রামদেশে তাদের ক্বচিৎ দেখা যায়। মানিক অবশ্য মন্দারিপুরে অনেক সাহেব দেখেছে, কিন্তু এখানকার অনেক চাষা বা জেলে জীবনে আগে কখনও ওই টুপিওয়ালা লালচে-ফর্সা লোকদের দেখেনি। বিশেষত মেমসাহেবটিকে দেখে তারা বিমোহিত।

পাশের নদী দিয়ে নৌকোয় যেতে যেতে গ্রাম্যবাজার দেখার শখ হয়েছিল তাদের। টাটকা পালং শাক, বরবটি ও বেগুন কিনল অনেক। সাহেবরা বোয়াল মাছ খায় না বোধহয়, এদিকে তাকিয়েও দেখেনি।

মানিক অবশ্য সাহেবদের পছন্দ করে না।

আজ হাটে যাবে মনে করেও শেষ পর্যন্ত গেল না মানিক। যোগীশ্বরের সঙ্গে খানিক পথ গিয়েও সে বলল, না, তুই যা! আমি আজ দুপুরে ঘুমাব।

ঘুমোবার জন্য সে চলে এল পুকুর ধারে। বড় বড় দুটো তেঁতুল গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকলে বড় আরাম হয়।

তাদের বাড়ি থেকে এই ঘাটে আসার পথে কচু ঝোপ সব সাফ হয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, সেখানে একটা মাত্র সাপ দেখা গেছে, সেটাও মরা। জাতসাপ ঠিকই, কিন্তু তাকে মারলো কে? আদিনাথ তো সাপ মারার কথা কিছু বলেননি। একটা গোক্ষুর সাপ দংশন করল আদিনাথকে, তিনি মরলেন না, মরে গেল সাপটা? যারা আফিং খায়, সাপ তাদের কামড়ালে নিজেই মরে যায়, এমন একটা কথা চালু আছে। আদিনাথ দু বেলাই একটা করে আফিং-এর গুলি খান বটে।

মরা সাপটার জন্য আদিনাথ সম্পর্কে মানুষের সম্ভ্রম আর একটু বেড়ে গেছে।

শুনশান দুপুর। এই সময় পুকুর ধারে সচরাচর কেউ আসে না। আজ রোদ তেমন চড়া নয়, তেঁতুল গাছের তলায় বেশ ঝিরিঝিরি ছায়া থাকে। আকাশও দেখা যায়। মেঘ জমছে আস্তে আস্তে।

উনিশ বছর বয়েস হয়ে গেল। বাবা কিছুতেই কলকাতায় যেতে দেবে না। পয়সা না পেলে মানিক যাবেই বা কী করে? রায়বাড়ির একটা ছেলে কলকাতায় গিয়ে কী কুকীর্তি করেছে, তার জন্য মানিক কেন দায়ী হবে?

ম্যাট্রিকে ফেল করার বেদনা তার কিছুতেই যায় না। অঙ্কটা দেখিয়ে দেবার মতন কেউ ছিল না। ইংরেজিতে মাত্র সাত নম্বর কম পেয়েছে। আর একবার সুযোগ পেলে সে পাশ করবেই করবে।

মাঝপুকুরে কী একটা আওয়াজ পেয়ে মানিক সচকিত হয়ে তাকাল।

এর মধ্যে কেউ স্নান করতে নামেনি। অত দূরে কেউ যায়ও না। তবে ওটা কী? তক্তা বা কলাগাছ নয়, জীবন্ত।

মানিকের ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল।

সব কিছু সম্পর্কেই গল্প থাকে। এই পুকুর সম্পর্কেও আছে।

অনেকেই এখনও এই পুকুরটাকে বলে কেতো-গনশার পুকুর। এর মধ্যে নাকি আছে দুটো বিশাল বিশাল গজাল মাছ (শোল মাছের আকৃতি), প্রায় ঢেঁকির সমান। ভদ্রলোকেরা এই মাছ খায় না, তাই ওদের মারার চেষ্টা হয়নি কখনও। ওরাও অত বড় হয়ে উঠেছে। মাছ দুটি এমনিতে খুব নিরীহ, সাঁতারুদের বিরক্ত করে না, পাড়ের কাছেও আসে না। একবার একটি সাত-আট বছরের শিশু, সাঁতার জানলেও হঠাৎ মাঝপুকুরে চলে গিয়ে খাবি খাচ্ছিল, ওই মাছ দুটো সেই শিশুটিকে কাঁধে বসিয়ে তীরে পৌঁছে দেয়। তখন থেকেই ওদের নাম দেওয়া হয় কার্তিক আর গণেশ। এ গল্প অনেককাল আগের, লোকের ধারণা তারা এখনও বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে একসঙ্গে ভেসে ওঠে, মেঘের মতন। অনেকেই দেখেছে, তবে কয়েকজন মিলে একসঙ্গে দেখেছে, এমন শোনা যায় না।

মানিক এ গল্পে কখনও আস্থা রাখেনি। আজ সে কয়েক মিনিট লক্ষ করে দেখলে, সত্যিই মাঝপুকুরে জীবন্ত কিছু রয়েছে। তা হলে দেখাই যাক।

গেঞ্জিটা খুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। এত বড় পুকুর, মাঝখানে যেতে বেশ সময় লাগে। তার সাঁতারের আওয়াজ শুনে মাছ দুটো পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মাথা তুলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে সে দেখল, মাছ হোক, যাই-ই হোক, সরছে না। আরও কাছে এসে দেখল, মাছ নয়, একটি মেয়ে।

নিঝুম দুপুরে এক জলকন্যা?

না, জলকন্যা বা পরিটরি কিছুই না, এ তো দিবাকরকাকুর মেয়ে পদ্মা। ওর পক্ষেই একা এমন কাণ্ড করা সম্ভব। মেয়েদের ঘাট দিয়ে নেমেছে, তাই মানিক টের পায়নি।

মানিক বলল, এই ছেমড়ি, এই অসময়ে তুই।

তাকে শেষ করতে না দিয়ে পদ্মা বলল, মাইনকা, তুই এতক্ষণ আমাকে দেখোস নাই? আমি ডাকতেছি তোরে—

মানিক বিস্মিত ভাবে বলল, তুই আমাকে ডাকছিস? এইখানে?

পদ্মা বলল, হ্যাঁ, তোর সাথে আমার একটা কথা আছে।

মানিক আবার বলল, এইখানে কথা? ডুব দিয়ে পাতালে যাব?

পদ্মা বলল, এখানে ছাড়া আর কোথায়...শোন মাইনকা, তোরে আমি একটা কথা জিগামু। তুই শুধু হ্যাঁ কিংবা না বলবি। কিন্তু, মানে, তবে, এই সব শুনতে চাই না। সোজাসুজি উত্তর দিবি।

—কী কথা শুনি?

—তুই আমাকে বিয়ে করবি?

উল্টে চিৎ হয়ে গিয়ে মানিক হা-হা করে হেসে উঠল।

একটু থতমত খেয়ে পদ্মা বলল, হাসছিস যে? এটা কি হাসির কথা?

মানিক বলল, আগে কয়েকখান বই পড়েছি, যাকে নবেল বলে, তার মধ্যে বিয়ের কথা উঠলেই প্রথমে ছেলেটা জিজ্ঞেস করে। মেয়েরা কক্ষনও বলে না। মেয়েদের মুখ দিয়া ওই কথা জিজ্ঞাসা করতে নাই! তুই কিছুই শিখলি না!

পদ্মা বলল, নাই তো নাই। তুই উত্তর দে!

দু'জনেই এবার চিৎ সাঁতার কাটছে, তাতে দম কম লাগে।

মানিক বলল, অত সহজ উত্তর দেওয়া? তুই আগে বল, হঠাৎ তুই কেন আমাকে, এই ভাবে, তোর কোনও বিপদ হয়েছে?

তুই কিছু জানিস না? আমাকে দেখার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে একখান দু'খান পাত্রপক্ষ আসছে, আর নাক বেঁকিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে যাচ্ছে।

কেন কেন? তুই তো একেবারে শ্মশানের পেতনির মতন না। পদী, তোকে তো চলনসই-ই বলা যায়।

চুপ কর হাঁদা কোথাকার। কেন সবাই অপছন্দ করে তা বুঝিস না? যা পণ চায়, সোনা গহনা চায়, তা দেবার সাধ্য আমার বাবার নাই। বাবাকে সবাই অপমান করে। আমার বাবার মতন ভালমানুষ এ পৃথিবীতে নাই। বাবার দুঃখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমার জন্যই বাবার ঘুম নাই... তুই কর না আমারে বিয়া, লক্ষ্মীটি, তুইও যদি পণ চাস, তা হলে আমি তোর চোখ গেলে দেব।

আমার যে এখন বিয়ে করার উপায় নেই রে পদী!

তুই কোনও শাকচুন্নিকে বিয়ে করবি বলে ঠিক করে ফেলেছিস?

না, তাও না। পদী, আমি এই গেরামে থাকব না। আমি চলে যাব।

কোথায়?

অনেক দূরে। পারলে, কলকাতায়। আমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। সেই অত বড় শহর। সেখানে কারুকে চিনি না, বাবা আমাকে এক পয়সাও দেবে না, কোথায় থাকব জানি না, তবু আমার না গেলে চলবেই না। এই কি আমার বিয়ে করার সময়, বল?

পদ্মা বলল, বুঝেছি, আচ্ছা থাক।

কয়েক মুহূর্ত বাদে সে আবার বলল, এই আকাশ সাক্ষী রইল...

কীসের সাক্ষী তাও বলল না পদ্মা, সে ফেরার সাঁতার শুরু করে দিল।

৫

আজ বৃহস্পতিবার, শুভদিন। চকমকিডাঙা থেকে পাত্রপক্ষ এসেছে বেলা বারোটায়। পাত্র নিজে আসেনি, তার বাবা ও মা, এক পিসি ও এক জ্যাঠা। দলটি ছোটই বলা যায়, অনেক সময় এই রকম দলে বাচ্চা-কাচ্চারাও আসে।

পেছনের দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর হাতে-বোনা আসন পাতা হয়েছে। আজ এদিকেই অন্য কর্ম উপলক্ষে এসেছিলেন আদিনাথ চৌধুরী, তারপর বন্ধু দিবাকরের বাড়িতে থেকে গেছেন। দিবাকর লাজুক মানুষ, আদিনাথই যেন কন্যাপক্ষের প্রধান।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যথাসম্ভব সাজিয়ে আনা হল পদ্মাকে। তার বিধবা দুই বোন রইল সম্পূর্ণ আড়ালে। কোনও শুভকাজে বিধবাদের মুখ দেখাতে নেই।

গত একবছর ধরে অনেকবারই চলছে এই মেয়ে-দেখা পর্ব, নতুনত্ব কিছু নেই। ফলাফলও অনেকটাই জানা। তবু গত্যন্তর নেই এ ছাড়া।

মেয়ের মা, পিসিই সব প্রশ্ন করতে লাগলেন, মেয়ের বাবা তামাক টানতে লাগলেন চুপচাপ। জ্যাঠাবাবুটি এ বাড়ির কটি ঘর কন্যাপক্ষের দখলে, কতখানি জমি, উঠোনের আম গাছটির আম মিষ্টি কিনা এই সব কথাই জানতে চাইলেন।

পদ্মা এমনিতে জেদী ও মুখরা, কিন্তু এখন সে খুবই শান্ত, অবনতমুখী। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যখন তাকে বলা হল, একটু হাঁটো তো মা, তখন সে সবাইকে ঘিরে এক পাশ হেঁটে এল, অর্থাৎ দেখানো হল, সে খোঁড়া নয়, পেটে অতিরিক্ত মেদ নেই ইত্যাদি। তুমি কী কী রান্না জান, এর উত্তরে সে গড়গড় করে বলে দিল, নিম বেগুন, লাউঘন্ট, ডুমুরের ঝোল, মাছের কালি, পুঁটি মাছের টক...। এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভাতের ফ্যান গালতে জান তো? তখন সে একটু ইতস্তত করতেই তার মা সৌদামিনী বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, ও মেয়েই তো রোজ আমাদের ভাত রেঁধে খাওয়ায়। ও চলে গেলে আমাদের খুব অসুবিধেই হবে।

পাত্রী বেশ লম্বা, গায়ের রং তেমন কালোও নয়, ফর্সাও নয়, মাজা মাজা, চোখ-নাকও বিসদৃশ কিছু নয়, বাড়ির বৌ হবার সব রকম যোগ্যতাই আছে তার। পাত্রটির চেহারা কেমন তা এরা কেউ জানে না, কানা-খোঁড়া বা যা কিছু একটা হতে পারে। সে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, গঞ্জের বাজারে এদের একটা কাপড়ের দোকান আছে, সেইখানে সে বসে।

পাত্রীর বাবা বেশি কথা বলেন না, তাই আদিনাথই মেয়ের যোগ্যতার কথা বোঝাচ্ছেন। আমাদের এই মেয়ে বড় লক্ষ্মীমন্ত, বড়দের কথা সব সময় শুনে চলে, পাড়া-প্রতিবেশীরাও এ মেয়েকে ধন্য ধন্য করে, খুব সুন্দর গানও গায়। একখানা গান গা তো মা।

তাতেও আপত্তি না জানিয়ে পদ্মা একটা শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়ে দিল। আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা—

সে গান শোনার পর অপ্রাসঙ্গিক ভাবে পাত্রের বাবা প্রশ্ন করলেন, এ বংশে কেউ পাগল আছে?

আদিনাথ বললেন, না, না, অতি শুদ্ধ বংশ। আমি আপনার ছেলের সঙ্গে ওর কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখেছি, একেবারে রাজযোটক হবে। নকীপুরের রাজারা নিয়মিত আমাকে ছক দেখাতে আসেন, এই তো গত মাসে ওঁদের ছোট ছেলের কুষ্ঠি বানিয়ে দিলাম।

আদিনাথ চৌধুরী যে এই এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর কথার ওজন আছে, সেটা তিনি বোঝাতে চাইলেও পাত্রের পিতা তা গ্রাহ্য করছেন না।

মা ও পিসি আরও কিছু পরীক্ষার পর মা বললেন, মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে। এবার আপনারা কথা বলুন।

সবাই জানে, পাত্রী একেবারে কুরূপা বা খুঁতো না হলে, পছন্দ হওয়া না-হওয়াটা আসল ব্যাপার নয়। আসল কথা এবার শুরু হবে।

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কবে নাগাদ দিতে চান?

পাত্রের বাবা ভাদুড়ী মশাই বললেন, আমরা তো এই অঘ্রানেই দেব ঠিক করেছি। এখন দেনা পাওনার যদি মিল হয়। শোনেন মশাই, আমি এক কথার মানুষ, দরাদরি পছন্দ করি না। সোনা তিরিশ ভরি, নগদ দেড় হাজার, তিরিশ খানা প্রণামী, পাত্রের জামা-জুতো আপনারা যেমন ভাল বোঝেন দেবেন। আর ধরেন পঞ্চাশজনের মতন বরযাত্রী, তাদের নৌকা ভাড়া।

দরজার আড়ালে পদ্মার মা আঁতকে উঠলেন, দিবাকরের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

আদিনাথ বললেন, এ পক্ষের তেমন সামর্থ্য নেই। কন্যাটি একটি রত্ন, এইটুকুই বুঝে দেখেন।

ভাদুড়ী মশাই এবার আদিনাথকে অগ্রাহ্য করে দিবাকরের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা কী দেবেন ঠিক করেছেন?

দিবাকর শুকনো গলায় বললেন, আমার চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। একেবারে সর্বস্বান্ত অবস্থা। কন্যার মায়ের হাতের চারগাছা চুড়ি অবশিষ্ট আছে, আর প্রণামীর দশখানা...

পাত্রের বাবা বললেন, অনেক বেলা হল, এবার ওঠার ব্যবস্থা করলে হয় না?

আদিনাথ বললেন, ভাদুড়ীমশাই, চার কন্যার বিবাহ দিতে হয়েছে। বুঝে দেখুন, এই বাজারে।

ভাদুড়ীমশাই এবার একটু কঠোরভাবে বললেন, চৌধুরীমশাই, আমিও দুটি কন্যার বিয়ে দিয়েছি। সে বিয়েও বিনা মাগনায় হয়নি। যথেষ্ট সম্পত্তি খসে গেছে। এখন নিজের ছেলের বিয়েতে কিছুটা উশুল করে নিতে হবে না? আরে মশাই, এই দুনিয়াটাই তো চলছে দেওয়া-নেওয়ার ওপর। তাও তো আমি নগদ বেশি চাইনি।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি দরাদরি করতে চান না। আসলে সে ব্যাপারে খুব উৎসাহ। দিবাকরের যে একেবারেই অত উঁচুতে ওঠার সামর্থ্য নেই, তা বুঝে গিয়ে অপমান করতে লাগলেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। তিরিশ ভরি সোনা কমিয়ে বড় জোর আঠাশ ভরি করা যায়, আপনারা... চার ভরি? বলেন কী করে এমন কথা!

আদিনাথ এতক্ষণ বিনয়ের অবতার সেজে ছিলেন, এবারে স্বমূর্তি ধরলেন।

তিনি বললেন, ভাদুড়ীমশাই, আপনারা কি এখান থেকে বাড়িতেই ফিরবেন, না অন্য কোথাও যাবার কথা আছে।

ঠিক বুঝতে না পেরে ভাদুড়ীমশাই বললেন, মানে?

আদিনাথ বললেন, মানে, শুধু কি এখানেই মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, না কি এর পর অন্য কোথাও যাবেন?

ভাদুড়ীমশাই একটু ইতস্তত করে বললেন, হ্যাঁ, একবার দায়ুদপুরেও ঘুরে যেতে হবে।

সেখানেও পাত্রী দেখার ব্যাপার আছে?

তা আছে বটে। এক ঘটক ধরেছে খুব করে।

তা হলে আর আপনাদের আটকানো ঠিক হবে না, বেলা বেশ হল।

দিবাকর চমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আদিনাথ হাত তুলে তাঁকে থামালেন। এ অঞ্চলের নিয়ম হচ্ছে, দুপুরে কোনও অতিথি এলে, পাত্রপক্ষের মতন বিশিষ্টজন হলে তো কথাই নেই, তাঁদের জন্য দ্বিপ্রহরের আহার্যের ব্যবস্থা করতে হয়। নৌকো ভাড়া দেওয়াও আবশ্যিক। এঁদের জন্য রান্না চাপানোও হয়েছে। আগে তো দেওয়া হয়েছে শুধু দুটি করে রসগোল্লা।

দিবাকরকে বাধা দিয়ে আদিনাথ আবার বললেন, শুধু শুধু ওঁদের দেরি করিয়ে দিয়ে লাভ কী? মাঝের পাড়ায় যেখানে হাট বসে সেখানে একটা হিন্দু-হোটেল আছে। খাঁটি ব্রাহ্মণ রাঁধুনি আমি জানি। আর ওখানেই পাবেন ভাড়ার নৌকো।

চোখ মুখ লাল হয়ে গেল ভাদুড়ীমশাইয়ের। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঠো, ওঠো এখন আর পান মুখে দিতে হবে না।

পাত্রের জ্যাঠামশাই কিঞ্চিৎ রসিক। তিনি এই অপমান গায়ে না মেখে, মৃদু হেসে বললেন, চৌধুরীমশাই, আমার ভাইয়ের ব্যাটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আপনাদের নেমন্তন্ন করে যাব। সপরিবারে আসতে হবে কিন্তু!

ওঁরা বিদায় নিলে দিবাকর ও আদিনাথ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে
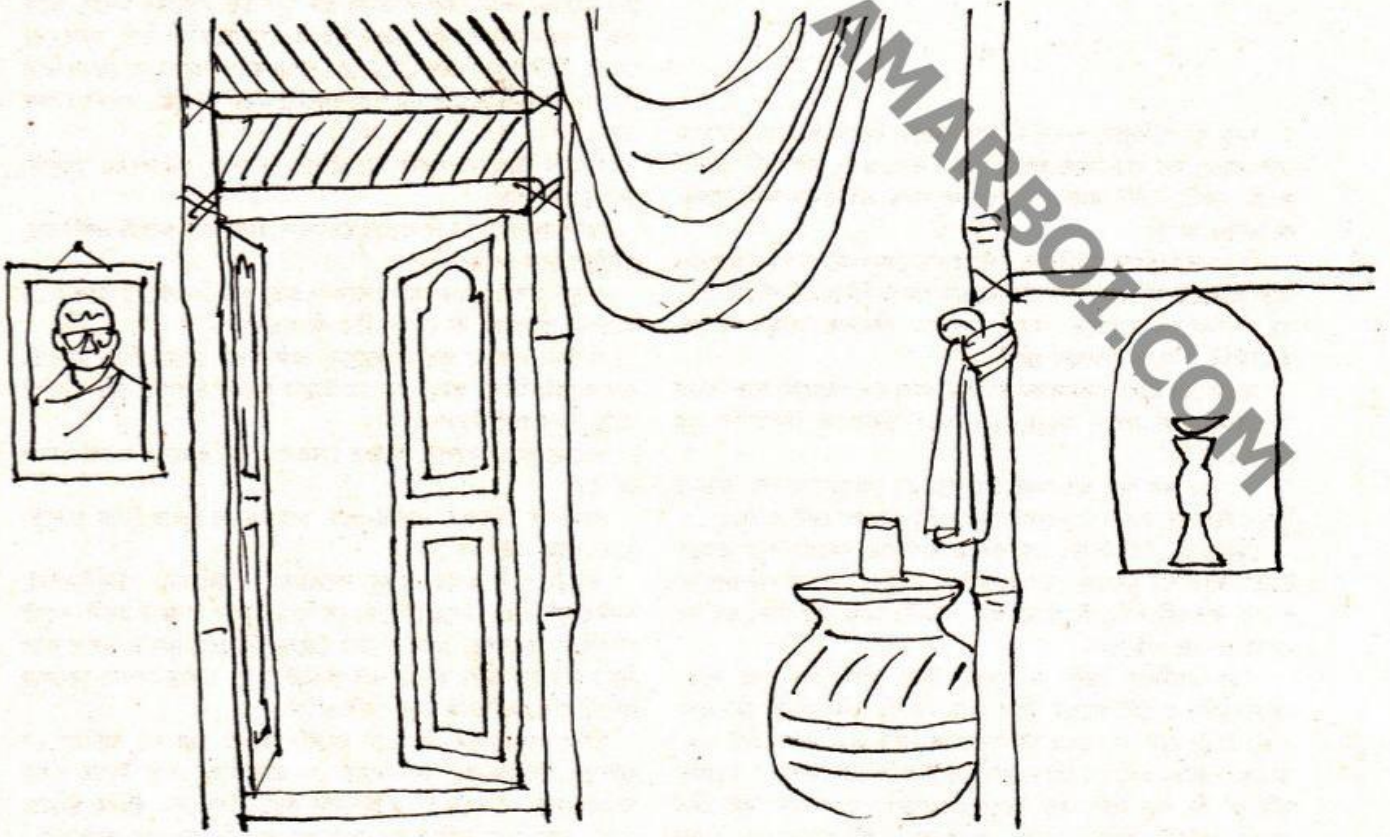
তামাক টানতে লাগলেন।

একটু পরে সৌদামিনী এসে বললেন, এমন ভাবে তাড়িয়ে দিলেন ওদের। এ খবর তো বাতাসে রটে যাবে। এর পর আর কোনও পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে আসবে?

দিবাকরের মতন শান্ত মানুষও রুষ্ট ভাবে বললেন, না আসুক। ওরা একেবারে চশমখোর।

সৌদামিনী বললেন, আহা-হা, মাইয়ার বিয়া দিতে হবে না? এইবার সমাজে পতিত করবে আমাদের, ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে।

আদিনাথ বললেন, বউমণি, আমাদের জাতের মধ্যে এখন পাত্রদের বাজার দর বেশ চড়া। পঁচিশ ভরির কমে কেউ রাজি হয় না। কানে তো আসে সব খবর। দো'জবরগুলাই পনেরো ভরি হাঁকে।

সৌদামিনী কপালে চাপড় মেরে বললেন, সোনা তো সব গ্যাছে। তাইলে আর আমাদের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার তো কোনও উপায় নেই। অথচ সমাজ আমাদের দুষবে? এ কেমন ধারা ধর্মের বিচার।

আদিনাথ বললেন, অত উতলা হবেন না। মেয়ে আপনাদের অত সুন্দর হয়েছে, যেমন মুখশ্রী, ডাগর ডাগর চোখ, তেমন নম্র ব্যবহার, ও যে গানও করতে পারে, আমি জানতাম না, মিষ্টি গলাই... এই পাত্রপক্ষ এমন রত্ন হাতছাড়া করে চলে গেল।

সৌদামিনী বলল, তাতে কী, এ কালে টাকা ছাড়া তো কোনও আশাই পূরণ হয় না।

আদিনাথ বললেন, আপনি গিয়ে দেখুন, পদী কান্নাকাটি করে কিনা। তাকে সামলান, আমি দিবুর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি।

দিবাকর বিমর্ষভাবে বললেন, এইবার বুঝি সমাজে টেকা দায় হবে।

আদিনাথ বললেন, হুঁ, তোমার ছোট কন্যাটি যে এমন ডাগরটি হয়েছে, আগে লক্ষ করিনি। ওর বয়েস কত হল?

দিবাকর বললেন, চোদ্দো-পনেরো হবে বোধহয়।

আদিনাথ হেসে বললেন, বন্ধুর কাছে বয়েস কমিয়ে বলে লাভ কী? কুষ্ঠিতে কত দেখলাম যেন, ওরে বাপরে, সতেরো। সপ্তদশী কন্যা একেবারেই পিতৃগৃহে অপালনীয়।

বন্ধু বলো তো, যে কন্যার পিতা প্রায় সর্বস্বান্ত, পাত্র-পক্ষের খাঁই না মিটিয়ে সে যদি বিয়ের ব্যবস্থা করতে না পারে, বস্ত্র, অলঙ্কার, তা ছাড়া এক গুচ্ছের বরযাত্রী আসে, তারা গাণ্ডে-পিণ্ডে খায়, কত নষ্ট করে...তা হলে সেই মেয়ের বাপ আর মেয়েরই বা কী গতি হয়?

—যতটা অধোগতি হবার তাই-ই হবে। আর একটা উপায় আছে। মনে মনে সেই মেয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে দিতে হয়। তাতে কোনও খরচ নেই। তারপর জন্মের শোধ তাকে পাঠিয়ে দিতে হয় বৃন্দাবন। তার পর যা বোঝার কৃষ্ণ বুঝবেন। থাকগে, ওসব কথা ছাড়ো। একটা কাজের কথা বলি?

—বলো। আমি আর কাজের কথা কী বুঝি?

—আজ আমার খুব রাগ হয়ে যাচ্ছিল। আরও কটু কথা যে ওই ভাদুড়ী হারামজাদাকে বলিনি, তা ওর বাপের ভাগ্য। তখনই মনে মনে ঠিক করেছি, এ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। অতি সুপাত্র আমরা নিজেরাই দেখে আসব, তারপর খরচ-খর্চা যা লাগে, কন্যার হাতের স্বর্ণালঙ্কার তার মাকেই দিতে হয়, বাদ বাকি পাত্র-পক্ষের খাঁই মেটাতে পঁচিশ-তিরিশ ভরি যা লাগে, আমিই ব্যবস্থা করে দেব। বরযাত্রীদেরও ঠিকই খাওয়াব, তবে মাঝে মাঝে আমাদের একজন রামদা হাতে করে ঘুরবে। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দিবাকর অভিভূত ভাবে বললেন, বহু ভাগ্যে এমন একজন বন্ধু পেয়েছি। তোমার প্রস্তাব মাথায় করে রাখলাম। তবে কি জান, কিছু নেবারও একটা যোগ্যতা থাকা দরকার। সে যোগ্যতা আমার নেই। তোমার এই দান, এত টাকাকড়ি আমি নিতে পারব না ভাই।

—কেন, কেন, দান কেন? বন্ধুকে বন্ধু কিছু দিতে পারে না?

—এক পক্ষের দেওয়াকে দানই বলে।

—তবে ধার বলে ধরে নাও। যখন পারবে তখন শোধ করবে।

—জীবনেও এত ধার শোধ করার সামর্থ্য আমার হবে না। শোনো, আদি, আমার বাবা সব পথ মেরে রেখে দিয়ে গেছেন। তিনি আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন যে, যাকে তুমি কিছু দিতে পারবে না, তার কাছ থেকে কিছু নেবে না। এটা শুধু বস্তুগত, বিষয়গত নয়। তার মানে, যে
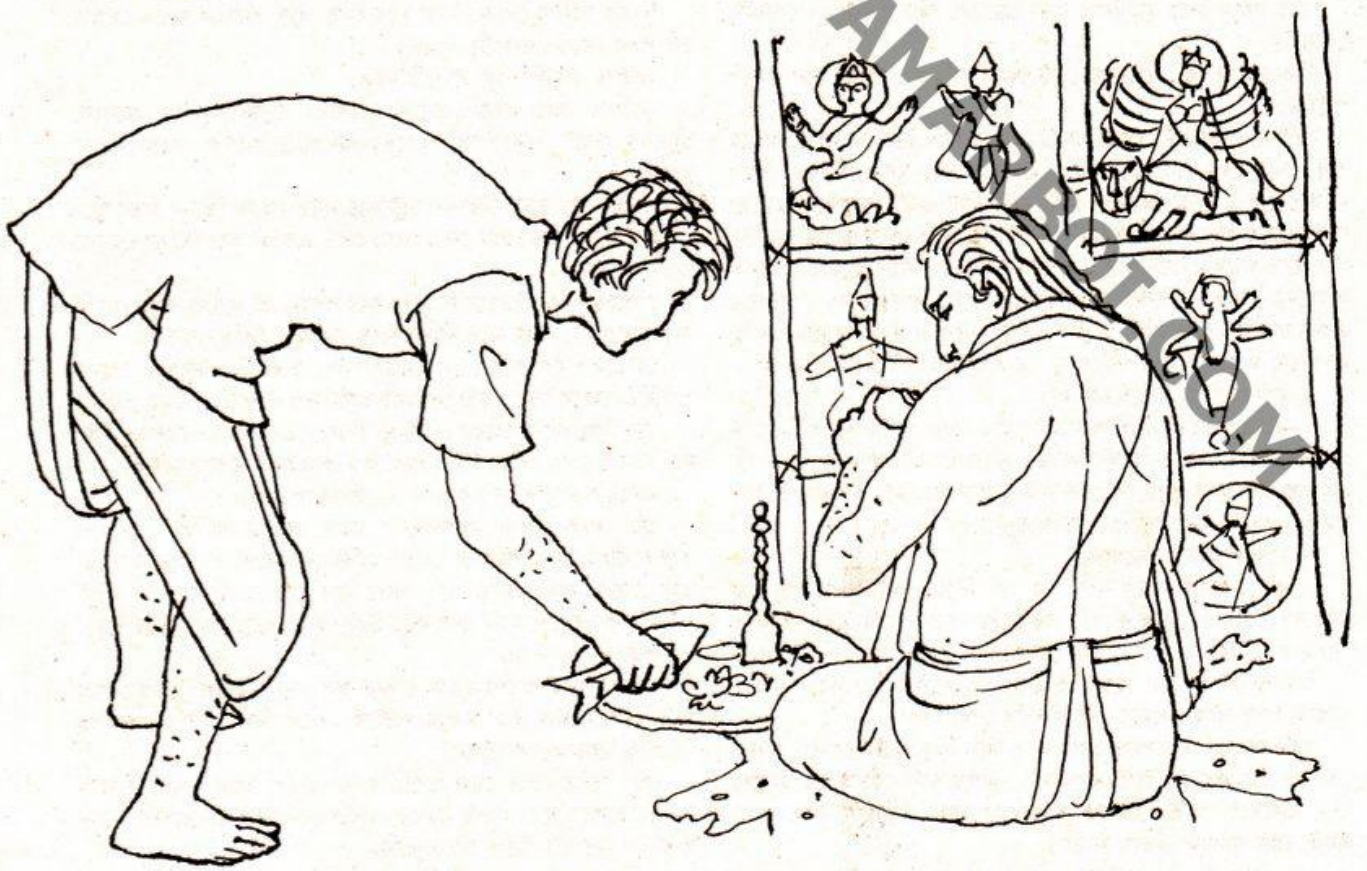
তোমাকে ভালবাসে না, তাকেও তুমি ভালবাসা দিতে পার। যাকে তুমি অর্থ সাহায্য করতে পার না বা সে ক্ষমতা নেই, তার কাছ থেকে তুমি অর্থ সাহায্য নিতেও পার না। আর শোধ দেবার সঙ্গতি নেই, অথচ ধার বলে কিছু নেওয়া তো তঞ্চকতা।

আদিনাথ ধমকের সুরে বললেন, তুমি থাকো তোমার নীতিবোধ নিয়ে।

চিবুকে হাত দিয়ে একটুক্ষণ চিন্তা করে আবার বললেন, কিন্তু সমাজ তো তোমাকে ছাড়বে না! পুরুষ মানুষ বিয়ে না করেও থাকতে পারে, কিন্তু অনূঢ়া কন্যা পরিবেশ নষ্ট করে।

দিবাকর বললেন, কোনও মেয়ে যদি আপন মনে থাকতে চায়, যদি পুজো-আচ্চা নিয়ে মেতে থাকে, তাতে সমাজের কী ক্ষতি?

—যৌবনে যে কন্যা কোনও পুরুষের অধীন নয়, তার দিকে লালায়িত হবে অন্য পুরুষরা। হবেই। যে জন্য যুবতী বিধবাদেরও অতি সাবধানে রাখতে হয়।

—পুরুষরা দোষ করলে সমাজ তাদের শাস্তি দেবে না?

—দিবু, তর্ক করে লাভ নেই। শাস্ত্রকাররা যা লিখে গেছেন তা সংশোধন করার সামর্থ্য আমাদের নেই, সমাজকে সামলাবার দায়িত্বও আমরা নিতে পারি না। আমরা ছা-পোষা গেরস্থ, যেমন চলছে তেমনি চলি। বামুন হয়ে জন্মালে যেমন কিছু কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়, তেমন কিছু কিছু দায়িত্বের নিগড়ে আমাদের বন্দিও থাকতে হয়। লোকদের আমরা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিই, আর নিজেরাই যদি কখনও...তোমার মনে আছে, বিপত্তারণ ঘোষালের কথা? তারও পাঁচ মেয়ে ছিল, ছোট মেয়েটি একটি কায়স্থ ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, তাতে সেই ফ্যামিলিরই ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে গেল। যদুনাথ পণ্ডিত একদিন বিপত্তারণের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে তার কী যেন একটা কথা শুনে তাকে এক চড় কষালেন... শেষ পর্যন্ত বিপত্তারণকে এ দেশ ছেড়েই চলে যেতে হল, সেই বর্মা মুল্লুকে, মনে নেই?

—হ্যাঁ মনে আছে। আমার তো সে রকম কোথাও যাবারও উপায় নেই। এখানে তবু যে-টুকু জমিজমা আছে, তাতে সম্বৎসর খোরাকির চালটা হয়। দু বেলা খাবারটা জুটে যায়, অন্য দেশে যাব কোন ভরসায়? শরীরেও আর তেমন তাগদ নেই।

—আমাদের বাঙালিদের স্বভাব কী জান, তোমাকে সহসা কেউ সাহায্য করতে আসবে না, কিন্তু তোমাকে কোনও শাস্তির কথা ঘোষণা হয়ে যাক, দলে দলে লোক ছুটে আসবে তোমাকে চড়-চাপড় মারতে। বাড়িতে আগুন ধরিয়েও দিতে পারে।

আবার কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে শ্যামা এসে দু'বার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য তাড়া দিয়ে গেছে, এঁদের ওঠার নাম নেই। উঠোনে গনগন করছে রোদ্দুর, কাক-চিলের ডাক ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই।

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে আদিনাথ বললেন, সব দিক চিন্তা করে আর একটি উপায় আমার মাথায় এসেছে। দিনু, তুমি শুনবে?

দিবাকর বললেন, অবশ্যই, বলো!

আদিনাথ বললেন, তোমার কন্যাটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আমিই ওকে বিবাহ করে তোমাকে দায়মুক্ত করতে পারি।

অকস্মাৎ শূলবিদ্ধ হবার মতন দিবাকর যেন সত্যিই কেঁপে উঠলেন। বিস্ফারিত চোখে, কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, কী বললে? ঠিক শুনেছি? তুমি, তুমি...

আদিনাথ বললেন, হ্যাঁ, আমি!

এবং এটাই যেন পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং যুক্তিসিদ্ধ কথা, সেটাই আরও সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবার মতন করে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় বিবাহ করলে দেওয়া নেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আমরা পাল্টি ঘর। আমার আর একটি বিবাহে আমার স্ত্রীর পূর্ণ সম্মতি আছে। সে তাড়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। সুলতানপুরের সঙ্গে আমি সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলেছি একেবারে, তার কারণ তোমায় পরে বলব। তোমার মেয়ে আমাদের বাড়িতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। মাঝে মধ্যেই সে এখানে চলে আসতে পারবে, তুমিও তাকে দেখতে যেতে পারবে যখন খুশি।

একটুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলেন দিবাকর। তারপর যেন অতি কষ্টে কিছুটা মনোবল সংগ্রহ করে বললেন, তার বদলে যদি তোমার ছেলের

সঙ্গে...

প্রায় হুঙ্কার দিয়ে আদিনাথ বলে উঠলেন, আমার ছেলে? কোনটি, কোনটি?

দিবাকর বললেন, তোমার ছোট ছেলে মানিক... সাহস করে বলতে পারিনি।

আদিনাথ বললেন, আমার ছোট ছেলের সঙ্গে তোমার একটি মেয়ের যদি বিবাহ হত, তার চেয়ে আর বেশি আনন্দের কী হতে পারে বল? কবে থেকে এ কথা ভেবেছি। কিন্তু মাইনকাটা একটা কুলাঙ্গার হয়েছে। তার বিয়ের বয়েস তো হয়েছেই, লেখাপড়াও শিখেছে যথেষ্ট, মেট্রিক পাশ হতে পারেনি বটে কিন্তু ক্লাস টেন পর্যন্ত তো বিদ্যে হয়েছে, তাই-বা ক'জনের আছে এদিকের দু' চারখানা গাঁয়ে? রায়বাবুদের সেরেস্তায় একটা চাকরিও হয়ে যাবে, তবু সে চাকরি নেবে না, বিয়ে করতেও রাজি নয়। তার মা তাকে কত বুঝিয়েছে, সে একথা কানেই নিতে চায় না।

—মানিক বিয়ে করতে চায় না?

—না তো নাই! সে কইলকাতায় যেতে চায়। আমি তাকে কিছুতেই যেতে দেব না। রায়বাবুদের বাড়ির সূর্যকান্ত কইলকাতায় গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না করেছে, বংশের নাম ডুবিয়েছে। নেহাত জমিদার বলে সমাজ ওদের কোনও শাস্তি দিতে পারে না।

—মানিক আমার মেয়েকে...

—শুধু তোমার মেয়ে বলে নয়, সে বিয়েই করবে না বলে গোঁ ধরেছে! তোমার মেয়েকে যদি আমাদের বাড়ির বৌ করে আনতে পারতাম...ভাগ্যে যা আছে, তাই তো হবে!

নিতান্ত কথার কথা হিসেবেই যেন এর পরেও দিবাকর বললেন, তাহলে পদুর সঙ্গে তোমার কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখা যাক।

আদিনাথ অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ও সবে কিছু আটকাবে না। আমিই তো কত লোকের কুষ্ঠি তৈরি করে দিই... আরে আমি তো অন্তত একশো বছর বাঁচবোই! যাও, তোমার পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখ। সবাই রাজি থাকলে শুভস্য শীঘ্রম।

দুপুরে আহার সেরে আদিনাথ আর বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা করলেন না। বেরিয়ে হেঁটে চলে গেলেন হন হন করে। রোদ্দুরের মধ্যে তাঁর ছাতাও লাগে না।

প্রস্তাবটি নিয়ে বাড়ির মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে সবাই হতবাক, এমন আবার হয় নাকি? ছেলের বদলে বাবা? তারপর শুরু হল তর্কবিতর্ক। সবাই মনে মনে জানে, এ ব্যাপারটা মোটেই ঠিক হতে পারে না, অথচ আদিনাথকে প্রত্যাখ্যানের যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। দিবাকরের শ্যালকরাও এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন, কারণ পদ্মাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে পার করতে না পারলে, সমাজের ভ্রূকুটি তাঁদেরও সহ্য করতে হবে। শুধু পদ্মাই মুখ ফুটে হ্যাঁ কিংবা না বলে না, সে শুধু হাসে।

সুতরাং সেটা সম্মতি হিসেবেই ধরে নেওয়া হল।

পরিবারের বাইরেও রটে গেল এই সংবাদ। আদিনাথ চৌধুরী তাঁর হাঁটুর বয়েসি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছেন, তাও সে বন্ধুর মেয়ে। অনেকেই তাতে তেমন অবাক হল না, তেমন একটা সমালোচনার গুজবও উঠল না। কেউ কেউ বলল, ওই সাপে কাটা লোকটা তো? ও সব পারে।

বিয়ের তারিখ ঘোষণা করা হয়ে গেল। হাঁদু তাঁতিকে বরাত দেওয়া হল শহর থেকে বেনারসি আনার।

তারপর একদিন সেই কাণ্ডটি ঘটল।

সেদিনও ছিল মাঝের গ্রামের হাটবার। বিকেল ফুরিয়ে এসেছে, হাটুরেরা সবাই ফেরার পথ ধরেছে। এদিককার পথেও লোক চলাচল যথেষ্ট।

তারই মধ্যে হঠাৎ দিবাকর চাটুজ্যের বাড়ি থেকে তিরের মতন ছুটে বেরিয়ে এলো তাঁর ছোট মেয়ে পদ্মা। হাতে একটা কেরোসিনের বোতল আর দেশলাই।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, এই দ্যাখো সবাই। আমি বিয়ে করব না! আমি মরে যাচ্ছি, বিয়ে করব না, বিয়ে করব না।

বোতলের কেরোসিন সে গবগব করে ঢেলে দিল নিজের পরনের শাড়িতে। জ্বেলে দিল একটা দেশলাই কাঠি। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন।

বেশ কিছু লোক ভয়ের চোটে ছুটে পালাতে লাগল। কয়েকজন কিছু দূর গিয়ে থমকে, পেছন ফিরে দেখতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর নাটক।

আসন্ন সন্ধ্যায় পদ্মা একটা জ্বলন্ত আগুনের শিখা।

হাট থেকে ফেরা মানুষজনের মধ্যে রয়েছে মানিক। এটা কি কাকতালীয়? নাকি পদ্মা দূর থেকে মানিককে দেখেই বেরিয়ে এসেছে, তার চোখের সামনে মরে গিয়ে শিক্ষা দিতে চেয়েছে তাঁকে।

মানিক দূর থেকে চিৎকার করে উঠল, পদি, শুয়ে পড়! শুয়ে পড়!

পদ্মা তা শুনল না।

অনেক লোক অবশ্য এর মধ্যে জল জল বলে চ্যাঁচাচ্ছে। প্রচণ্ড জোরে ছুটে এসে মানিক এক ধাক্কায় পদ্মাকে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর গড়াগড়ি দিতে লাগল দুজনে।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল পদ্মা। তাকে আরও অনেক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হবে বলেই সম্ভবত প্রাণটা গেল না তার। মাসখানেকের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠল অনেকখানি।

মানিক অবশ্য পরদিনই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। যাওয়ার সময় সে তার মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপি ফাঁকা করে দিয়েছিল, সেখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুণ্ডু আঁকা কিছু রুপোর টাকা ছিল, সব মিলিয়ে সাতানব্বইটি।

সেদিনকার ওই আগুন নেভাতে গিয়ে মানিক নিজে কতটা দগ্ধ হয়েছিল, তা আর জানল না কেউ।

(আদি পর্ব সমাপ্ত)

এই কাহিনিতে অবিভক্ত বাংলার এককালের কয়েকটি অনুন্নত গ্রামের পটভূমি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সে অঞ্চলের কথ্য ভাষা রক্ষিত হয়নি।

—লেখক

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী